অধ্যায় ৯

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা
(CONTINUATION OF HUMAN LIFE)

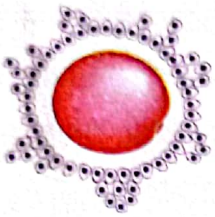

প্রজনন প্রতিটি জীবের সহজাত প্রবৃত্তি। জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এবং বংশবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো মানুষেরও প্রজনন সম্পন্ন হয়। মানুষের প্রজনন এবং যৌন ক্রিয়া সমাজ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের দ্বারা মানুষের প্রজনন সম্পন্ন হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত আছে বিভিন্নরকম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যাদের যে কোনো একটিতে সমস্যা হলে প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। সমাজের সকল ধরনের মানুষ প্রজননের সাথে জড়িত বলে এ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। এ অধ্যায়ে মানব প্রজননতন্ত্র এবং প্রজননের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- প্রজননতন্ত্র
- বয়োঃসন্ধিকাল
- স্পার্মাটোজেনেসিস
- উওজেনেসিস
- নিষেক
- ইমপ্লানটেশন
- অমরা
- নাভী রজ্জু
- টেস্ট টিউব বেবি
- ভেনারিয়েল ডিজিস
- এইডস

পিরিয়ড সংখ্যা ১১। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে -

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ● স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া
২। প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা বর্ণনা করতে পারবে।	● প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা ○ রজঃচক্র ও বয়োসন্ধিকাল ও এ সময়ের পরিবর্তনসমূহ ○ গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক, ইমপ্লান্টেশন ○ ভ্রূণ গঠন ও তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি
৩। গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	● গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা
৪। গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।	● গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা
৫। আইভিএফ পদ্ধতির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● আইভিএফ পদ্ধতি-কৃত্রিম গর্ভধারণ
৬। প্রজনন জনিত সমস্যাসমূহের প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● প্রজননতন্ত্রের সমস্যা ○ পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা ○ পুরুষ ও নারীর প্রজননে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ○ ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা
৭। যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে।	● যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস) লক্ষণ ও প্রতিকার।
৮। প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং এর সুষ্ঠুতা রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারবে।	

CamScanner

৯.১ মানব প্রজননতন্ত্র (Human reproductive system)

মানবদেহের যে তন্ত্র প্রজননের সাথে জড়িত তাকে প্রজননতন্ত্র বলে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ এদের পুং ও স্ত্রী জননতন্ত্র যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলার দেহে অবস্থান করে।

পুংজনন তন্ত্র (Male reproductive system)

পুরুষ দেহে বিদ্যমান যে তন্ত্র শুক্রাণু উৎপাদন ও সঞ্চয় করে এবং শুক্রাণুকে পরিবহন করে স্ত্রীদেহের জননালিতে স্থানান্তর করে সার্বিকভাবে মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে পুংজননতন্ত্র বলে। মানব পুংজননতন্ত্র প্রধান জননাঙ্গ শুক্রাশয়, কতগুলো নালি (ইপিডিডাইমিস, শুক্রনালি, ক্ষেপণ নালি, ইউরেথ্রা) এবং কয়েকটি সহকারি গ্রন্থি (সেমিনাল ভেসিকল, প্রোস্টেট গ্রন্থি, কওপার গ্রন্থি) নিয়ে গঠিত। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

১। শুক্রাশয় (Testes): শুক্রাশয় পুরুষের প্রধান জনন অঙ্গ। উদরের নিচে দুই উরুর সন্ধিস্থলে চামড়া নির্মিত একটি থলিতে দুটি শুক্রাশয় অবস্থান করে। এ থলিকে অণ্ডথলি বা স্ক্রোটাম (scrotum) বলে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় শুক্রাশয় উদরের পেলভিক গহ্বরে বিকশিত হয়, কিন্তু শিশু জন্মের সময় এগুলো উদর গহ্বর হতে বের হয়ে অণ্ডথলিতে অবস্থান নেয়। শুক্রাশয়কে বহিঃউদরীয় অঙ্গ (extra-abdominal organ) বলে কারণ এতে দেহ তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায় শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। মানুষের অণ্ডথলিতে যে তরল থাকে তাকে হাইড্রোসিল (hydrocoel) বলে। এর তাপমাত্রা স্বাভাবিক দেহ তাপমাত্রা হতে 2°C কম থাকে যা শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

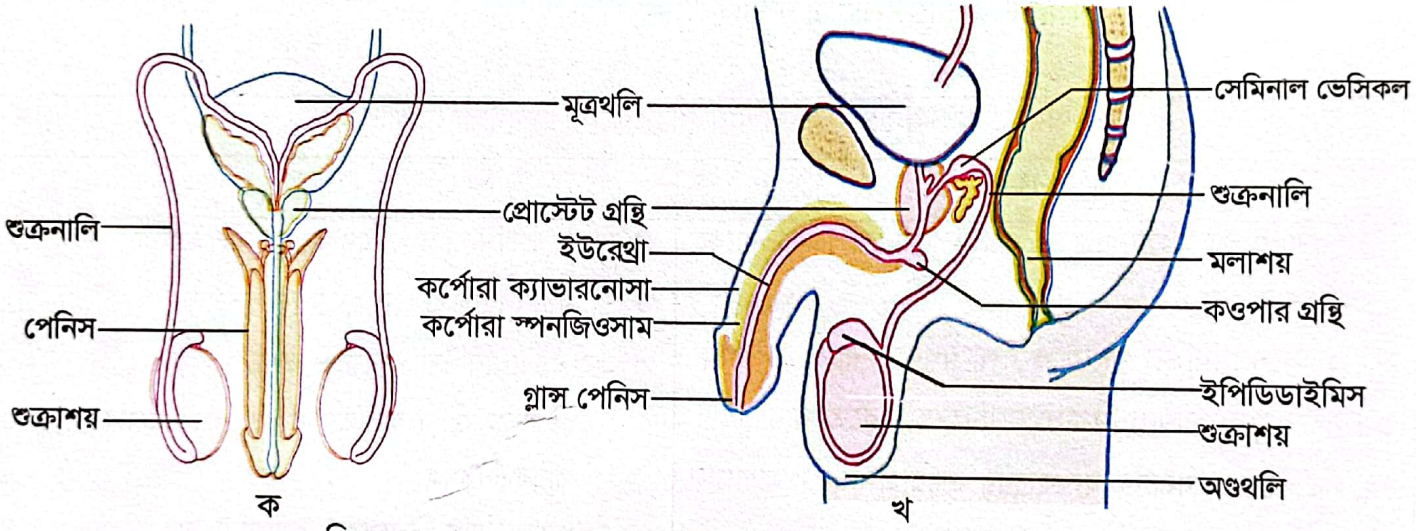

চিত্র ৯.১ মানুষের পুং জননতন্ত্র (ক) সম্মুখদৃশ্য (খ) পার্শ্বদৃশ্য

মানুষের প্রতিটি শুক্রাশয় ডিম্বাকৃতির এবং প্রায় 4-5 সেন্টিমিটার লম্বা। প্রতিটি শুক্রাশয় টিউনিকা অ্যালবুজেনিয়া (tunica albuginea) নামক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে প্রায় 1000 সেমিনিফেরাস নালিকা থাকে। নালিকাগুলো ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (interstitial cells) বা লেডিগ কোষে (Leydig cells) ডুবানো থাকে। সেমিনিফেরাস নালিকা লম্বা ও প্যাঁচানো নালিকা বিশেষ যার অন্তঃপ্রাচীর জার্মিনাল এপিথেলিয়াম (germinal epithelium) নামক এককোষী স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম দুধরনের কোষ দ্বারা গঠিত, যথা- স্পার্মাটোজেনেটিক কোষ (spermatogenic cells) এবং সার্টলি কোষ (sertoli cells)। স্পার্মাটোজেনেটিক কোষ থেকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। সার্টলি কোষ বিকাশমান শুক্রাণুকে পুষ্টি সরবরাহ করে।

কাজ: শুক্রাণু উৎপাদন করা শুক্রাশয়ের প্রধান কাজ। এছাড়া এরা পুং যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ করে। মানুষের শুক্রাশয় প্রতিদিন 10 মিলিয়ন শুক্রাণু উৎপাদন করে। একজন পুরুষ 6 মাসে যে পরিমাণ শুক্রাণু উৎপাদন করে তা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সমান।

CamScanner

২। ইপিডিডাইমিস (Epididymis): প্রতিটি শুক্রাশয়ের পেছনের গাত্রে কুণ্ডলিত অবস্থায় যে সরু নালি বিদ্যমান থাকে তাকে ইপিডিডাইমিস বলে। এ নালিকে সোজা করলে প্রায় 4-6 মিটার লম্বা হয়। ইপিডিডাইমিস নিম্নের তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:

(ক) মস্তক বা ক্যাপুট ইপিডিডাইমিস (Head or caput epididymis) : এটি সেমিনিফেরাস নালিকার সাথে যুক্ত থাকে।

(খ) দেহ বা মধ্য ইপিডিডাইমিস (Body or middle epididymis): এটি ইপিডিডাইমিসের মাঝের অংশ।

(গ) লেজ বা কওডা ইপিডিডাইমিস (Tail or cauda epididymis): এটি শুক্রনালির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ: এটি শুক্রাণুকে প্রায় একমাস সঞ্চিত রাখতে পারে। এটি শুক্রাণুর পূর্ণতা লাভের জন্য পুষ্টি পদার্থের ক্ষরণ ঘটায়।

৩। শুক্রনালি (Vas deferens): প্রতিটি ইপিডিডাইমিস এর প্রান্তভাগ হতে প্রায় 40-50 সেন্টিমিটার লম্বা, গহ্বরযুক্ত ও পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট একটি নালি উত্থিত হয়ে অণ্ডথলির ইংগুইনাল (inguinal) ছিদ্র দিয়ে শ্রোণিগহ্বরে প্রবেশ করে। একে শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স বা ডাক্টাস ডিফারেন্স বলে। এটি মূত্রথলির উপর দিয়ে বেঁকে এসে সেমিনাল ভেসিকলের নালিকার সাথে যুক্ত হয়।

কাজ: এটি শুক্রাশয় থেকে ক্ষেপণ নালিতে শুক্রাণু পরিবহন করে। এটি অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখে।

৪। ক্ষেপণ নালি (Ejaculatory duct): শুক্রনালি ও সেমিনাল ভেসিকলের নালি একত্রে মিলিত হয়ে 19 মিলিমিটার লম্বা ও 0.3 মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট যে নালি গঠন করে তাকে ক্ষেপণ নালি বলে। এটি প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে মূত্রনালি বা ইউরেথ্রার সাথে যুক্ত হয়।

কাজ: এর মাধ্যমে সেমিনাল ভেসিকল এর ক্ষরণসহ শুক্রাণু ইউরেথ্রায় প্রবেশ করে।

৫। ইউরেথ্রা (Urethra): এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি সাধারণ নালি। এটি প্রায় 20 সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিশ্নের (লিঙ্গের) শীর্ষদেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ: এ নালির মাধ্যমে বীর্য বাহিরে স্খলিত হয় এবং মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

৬। সহকারি গ্রন্থি (Accessory glands)

(ক) সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle): পেলভিক গহ্বরে মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একজোড়া লম্বাকৃতির, পেশিময়, থলিকাকার গ্রন্থিকে সেমিনাল ভেসিকল বলে। এটি একটি ক্ষুদ্র নালি দ্বারা শুক্রনালির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ: এটি শুক্রাণুকে ধারণ করার জন্য পিচ্ছিল ও সান্দ্র সেমিনাল তরল (seminal fluid) ক্ষরণ করে যার 70% বীর্য বা সিমেন (semen) গঠন করে। বীর্যের প্রধান উপাদান হলো প্রোস্টাগ্লান্ডিন, ফ্রুক্টোজ, সাইট্রেট, ইনোসিটল ও কয়েক ধরনের প্রোটিন। এসব পদার্থ শুক্রাণুকে পুষ্টি প্রদান করে।

(খ) প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland): এটি ইউরেথ্রার নিচে অবস্থিত নাসপাতি আকৃতির একটি গ্রন্থি। এর প্রাচীর পেশিবহুল ও গ্রন্থিময় কলা দ্বারা গঠিত। কয়েকটি ক্ষুদ্র নালিকা দ্বারা এ গ্রন্থি ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়।

কাজ: এ গ্রন্থি থেকে এক ধরনের ক্ষারীয় তরল নিঃসৃত হয় যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর তরল যোনির ভেতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে শুক্রাণুকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।

(গ) কওপার গ্রন্থি বা বাল্বোইউরেথ্রাল গ্রন্থি (Cowper's gland or Bulbourethral glands): ইউরেথ্রার দুপাশে দুটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতির গ্রন্থি বিদ্যমান। এদের কওপার গ্রন্থি বা বাল্বোইউরেথ্রাল গ্রন্থি বলে। দুটি খাটো নালির মাধ্যমে এরা ইউরেথ্রার সাথে সংযুক্ত থাকে।

কাজ: সঙ্গমকালে এ গ্রন্থি থেকে পিচ্ছিল মিউকাস পদার্থ নিঃসৃত হয় যা যোনিপথকে পিচ্ছিল রাখে।

৭। শিশ্ন (Penis): যে পেশিবহুল ও নরম অঙ্গের মধ্য দিয়ে ইউরেথ্রা প্রসারিত হয় তাকে শিশ্ন বা লিঙ্গ বলে। এটি পুরুষের বহিঃযৌনাঙ্গ বা সঙ্গম অঙ্গ। স্বাভাবিক অবস্থায় এটি অণ্ডথলির উপর ঝুলে থাকে। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় এটি

CamScanner

শক্ত ও সোজা হয়ে থাকে। কর্পোরা ক্যাভারনোসা (corpora cavernosa) ও কর্পোরা স্পনজিওসাম (corpora spongiosum) নামক স্থিতিস্থাপক পেশি দিয়ে শিশ্ন গঠিত। শিশ্নের চকচকে শীর্ষভাগকে গ্ল্যান্স পেনিস (glans penis) বলে। এ অংশ অত্যন্ত সংবেদনশীল। গ্লান্স পেনিস যে চামড়া দিয়ে আবৃত থাকে তাকে প্রিপিউস (prepuce) বলে। মুসলমান ও ইহুদীদের এ চামড়া কেটে ফেলা (circumcision) হয়।

কাজ: শিশ্ন যৌন সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে। এটি শুক্রাণুকে স্ত্রী জননতন্ত্রের ভেতরে প্রেরণ করে।

হরমোনাল ক্রিয়া

বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানুষের পুং প্রজননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের কিছু হরমোন অন্য হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে এবং কিছু হরমোন সরাসরি প্রজনন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। স্ত্রীদের মতো পুরুষের হরমোনাল ক্রিয়া মাসিক চক্রাকারে আবর্তিত হয় না বরং এগুলো পুরুষের সমগ্র প্রজনন বয়সে সমভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। প্রধান আট ধরনের হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানব পুংজননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন-

১। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotrophin releasing hormone- GnRH): মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত হয়। এটি পিটুইটারি গ্রন্থিকে লুটিনাইজিং হরমোন এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি শুক্রাণু উৎপাদন ও টেস্টোটেরন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

২। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone –FSH): পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুজনন ঘটায়।

৩। লুটিনাইজিং হরমোন (Luteinising Hormone-LH): পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহকে উদ্দীপিত করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়।

৪। লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Hormone -LTH): পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

৫। গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoids): অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। এটি ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌন গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৬। অ্যান্ড্রোস্টেরন (Androsterone): শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত হয়। এটি পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া এটি খনিজলবণ বিপাকে সহায়তা করে।

৭। টেস্টোস্টেরন (Testosterone): শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত হয়। এটি পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে। এটি খনিজলবণ বিপাকে সহায়তা করে।

৮। ইনহিবিন (Inhibin): শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি GnRH এবং FSH ক্ষরণ মাত্রা হ্রাস করে।

স্ত্রী জননতন্ত্র (Female reproductive system)

স্ত্রীদেহের যে তন্ত্রে ডিম্বাণু উৎপাদন, নিষেক ক্রিয়া সম্পাদন, ভ্রূণ সংস্থাপন ও ভ্রূণের বিকাশ সম্পন্ন হয় তাকে স্ত্রীজননতন্ত্র বলে। মানুষের স্ত্রী জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত -

১। ডিম্বাশয় (Ovaries): শ্রোণিগহ্বরের পেছন দিকে একজোড়া ডিম্বাশয় বিদ্যমান। প্রতিটি ডিম্বাশয় 3-5 সেন্টিমিটার লম্বা, 2-3 সেন্টিমিটার চওড়া ও 0.6-1.5 সেন্টিমিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট এবং দেখতে অনেকটা কাঠ বাদামের মতো। প্রতিটি ডিম্বাশয় ব্রুড লিগামেন্ট (brood ligament) দ্বারা জরায়ুর প্রাচীরে আটকানো থাকে। মেসোভেরিয়াম পর্দা (mesovarium membrane) নামক পাতলা আবরণ দ্বারা ডিম্বাশয় আবৃত থাকে। ডিম্বাশয়ের প্রাচীর জার্মিনাল এপিথেলিয়াম (germinal epithelium) দ্বারা গঠিত। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ডিম্বাশয়ে যেসব গঠন দেখা যায় সেগুলো হলো: ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, স্ট্রোমা, প্রাইমোর্ডিয়াল ফলিকল, গ্রাফিয়ান ফলিকল, কর্পাস লুটিয়াম ইত্যাদি।

CamScanner

কাজ: ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ ডিম্বাণু উৎপাদন করা। এর প্রাচীর থেকে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন হরমোন ক্ষরিত হয়।

২। ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালি (Oviducts or fallopian tubes): জরায়ুর দুপাশ থেকে দুটি নালি দুই ডিম্বাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এদের ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালি বলে। প্রতিটি ফেলোপিয়ান নালি প্রায় 12 সেন্টিমিটার লম্বা। এর প্রাচীর পেশিবহুল। এর একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের নিকটে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে এবং অন্যপ্রান্ত জরায়ু গহ্বরে উন্মুক্ত থাকে। এর ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি ফানেল আকৃতির ইনফান্ডিবুলাম (infundibulum) গঠন করে। এর কিনারা থেকে **ফিমব্রি** (fimbriae) নামক কতগুলো অভিক্ষেপ বের হয়ে ঝালরের মতো অবস্থান করে। ফিমব্রি এবং ডিম্বনালির অন্তর্গাত্র সিলিয়াযুক্ত।

কাজ: ডিম্বাশয়ে সৃষ্ট ডিম্বাণু ডিম্বনালি দ্বারা পরিবাহিত হয়ে জরায়ুতে পৌঁছায়। এর প্রাচীর থেকে নিঃসৃত রস নিষেকের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ডিম্বনালিতে নিষেক সম্পন্ন হয়।

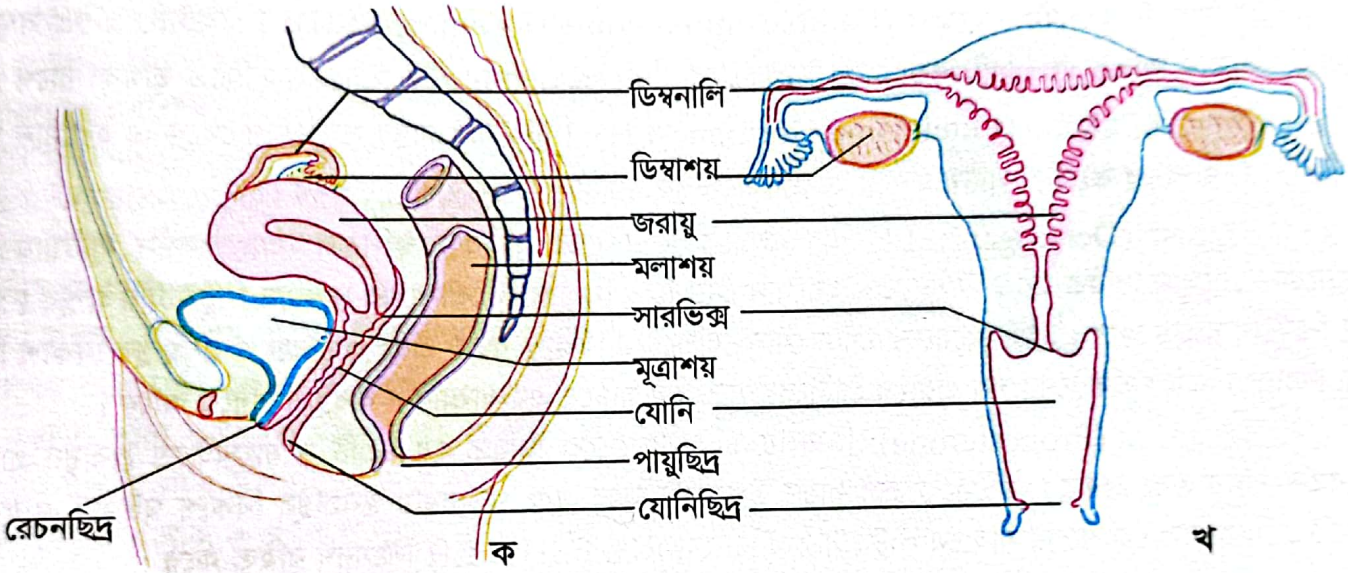

চিত্র ৯.২ মানুষের স্ত্রী জননতন্ত্র (ক) পার্শ্বদৃশ্য, (খ) সম্মুখদৃশ্য

৩। জরায়ু (Uterus): জরায়ু শ্রোণিগহ্বরে মূত্রাশয়ের পেছনে এবং মলাশয়ের সামনে অবস্থিত পুরুপ্রাচীরযুক্ত পেশিবহুল নাসপাতি আকৃতির একটি ফাঁপা অঙ্গ। স্বাভাবিক অবস্থায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় 8 সেন্টিমিটার, প্রস্থ প্রায় 5 সেন্টিমিটার এবং পুরুত্ব প্রায় 3 সেন্টিমিটার । একটি সাধারণ জরায়ুর ওজন প্রায় 60 গ্রাম কিন্তু গর্ভধারণের সময় জরায়ু প্রায় 20 গুণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় 1 কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট হয়। জরায়ুর প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। বাইরের স্তরকে পেরিমেট্রিয়াম (perimetrium), মাঝের স্তরকে মায়োমেট্রিয়াম (myometrium) এবং অন্তঃস্থ স্তরকে এন্ডোমেট্রিয়াম (endometrium) বলে। জরায়ুর উপরের দিকে নির্দেশিত গম্বুজ আকৃতির অংশকে ফান্ডাস (fundus), মাঝের অংশকে দেহ বা করপাস (body or corpus) এবং নিচের দিকে নির্দেশিত সরু অংশকে সারভিক্স (cervix) বলে। সারভিক্স যোনিতে উন্মুক্ত হয় এবং এর সরু পথে বীর্যরস (semen) জরায়ুতে প্রবেশ করে।

কাজ: জরায়ুতে নিষিক্ত জাইগোট সংস্থাপিত হয় এবং এখানেই ভ্রূণের বিকাশ ঘটে। জরায়ুর প্রাচীর থেকে অমরা গঠিত হয়। অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন হয়।

৪। যোনি (Vagina): মূত্রনালির নিচ দিয়ে প্রসারিত 8-10 সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদকে যোনি বলে। এর এক প্রান্ত জরায়ুতে এবং অন্য প্রান্ত দেহের বাহিরে উন্মুক্ত থাকে। যোনির প্রাচীরে রুগি (rugue) নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে। দুটি মাংসল ভাঁজ কপাটের মতো যোনিপথকে ঢেকে রাখে। এদের লেবিয়া মেজরা (labia majora) ও লেবিয়া মাইনরা (labia minora) বলে। লেবিয়া মেজরার উপরের দিকে একটি ছোট মাংসপিণ্ড থাকে। একে ক্লাইটোরিস (clitoris) বা ভগাংকুর বলে। এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

CamScanner

কাজ: সঙ্গমের সময় যোনি শিশ্ন গ্রহণ করে। এর প্রাচীর থেকে মিউকাসযুক্ত পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে সঙ্গমকে আনন্দময় করে। সন্তান প্রসবের সময় এটি প্রসারিত হয়ে প্রসবকে সহজ করে।

৫। বার্থোলিন গ্রন্থি বা ভেস্টিবুলার গ্রন্থি (Bartholin's or vestibular glands): যোনি ছিদ্রপথের উভয় পাশে একটি করে বার্থোলিন গ্রন্থি বা ভেস্টিবুলার গ্রন্থি থাকে। সঙ্গমের সময় এগুলো থেকে পিচ্ছিলকারী তরল নিঃসৃত হয়।

হরমোনের ক্রিয়া

মহিলাদের হরমোনাল ক্রিয়া মাসিক চক্রাকারে আবর্তিত হয়। প্রধান আট ধরনের হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানব স্ত্রী জননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন-

১। গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotrophin releasing hormone-GnRH): মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পিটুইটারি গ্রন্থিকে লুটিনাইজিং হরমোন (LH) এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি ডিম্বাণু উৎপাদন ও ইস্ট্রোজেন মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

২। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone–FSH): পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভোলেশন ও ইস্ট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৩। লুটিনাইজিং হরমোন (Luteinising Hormone-LH): পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি ডিম্বাশয়ের কর্পোরা লুটিয়াম সৃষ্টি ও প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ ত্বরান্বিত করে।

৪। ইস্ট্রোজেন (Oestrogen): LH এর প্রভাবে ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধিরত ফলিকল এবং কর্পাস লুটিয়াম থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হয়। ইস্ট্রোজেন হরমোন নেগেটিভ ফিডব্যাক কৌশলের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্রন্থির FSH ও LH নিঃসরণ রহিত করে। এটি মেয়েদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এটি গর্ভধারণের পর জরায়ুর প্রাচীরের সঙ্কোচন ঘটিয়ে এর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে।

৫। প্রোজেস্টেরন (Progesterone): ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে ক্ষরিত হয়। এটি বয়োঃসন্ধিতে জরায়ুর প্রাচীরের পরিবর্তন ঘটায় এবং জরায়ুর প্রাচীরকে ভ্রূণ ধারণ উপযোগী করে এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়। এ হরমোন নেগেটিভ ফিডব্যাক কৌশলের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্রন্থির GnRH, FSH ও LH নিঃসরণ রহিত করে।

৬। লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Hormone-LTH): পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। একে প্রোল্যাকটিন হরমোনও বলে। স্ত্রীদের স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটায়।

৭। গোনাডোকর্টিকয়েড (Gonadocorticoids): অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এরা ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌন গ্রন্থি, যৌন অঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৮। রিলাক্সিন (Relaxin): ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি প্রসবের সময় শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটায়। ভ্রূণ বৃদ্ধির সময় এটি জরায়ুর প্রাচীরের সঙ্কোচন রোধ করে প্রাকৃতিক গর্ভপাত রহিত করে। এটি স্ত্রীদের স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধ ক্ষরণ ঘটায় এবং জরায়ুর অভ্যন্তরে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৯.২ প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা

১। বয়োঃসন্ধিকাল (Puberty/Adolescence)

সাধারণত কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকে বয়োঃসন্ধিকাল বলে। শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় 'মানবজীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রী দেহে বাহ্যিক গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ (secondary sexual characters) বিকশিত হতে থাকে এবং প্রজনন অঙ্গগুলো সক্রিয় হতে শুরু করে তাকে বয়োঃসন্ধিকাল বলে'। [*যেসব বৈশিষ্ট্য শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে যৌবন প্রাপ্তির সময় দেহে প্রকাশ পায় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সূচনা করে তাদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বলে, যেমন- মেয়েদের স্তন, ছেলেদের দাঁড়ি-গোঁফ ইত্যাদি।*] গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছেলেদের 13-14 বছর বয়সে এবং

CamScanner

মেয়েদের 10-12 বছর বয়সে বয়োঃসন্ধিকাল শুরু হয়। শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের এ ঘটনা আরো 3-4 বছর পরে শুরু হয়। এসময় জননাঙ্গের হরমোন নিঃসরণ ও গ্যামিট উৎপাদনের সূচনা ঘটে। বয়োঃসন্ধিকালে যৌন হরমোনের প্রভাবে দেহের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে এসব পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। বয়োঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন ঘটে তাদের টেনার দশা (Tanner stages) বলা হয়। শিশু-কিশোর বিশেষজ্ঞ জ্যামস এম টেনার (James M. Tanner) এর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে, কেননা তিনি মানবদেহের এসব পরিবর্তন প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মেয়েদের বয়োঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

১। স্তন বা ব্রেস্ট বিকশিত হতে শুরু করে যা মেয়েদের দেহের প্রথম পরিবর্তন; একে থেলারচি (thelarche) বলে।
২। দ্রুত উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
৩। চামড়া তেলতেলে হয়, সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৪। অক্সিলারি (বগল) ও পিউবিক লোম গজাতে শুরু করে, একে পিউবারচি (pubarche) বলে।
৫। রজঃচক্র (মাসিক) শুরু হয়; প্রথম রজঃচক্রকে মেনারচি (menarche) বলে।
৬। অ্যাডরেনাল গ্রন্থির এন্ড্রোজেন হরমোন নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
৭। নিতম্ব, উরু ও স্তনে চর্বি সঞ্চিত হতে থাকে এবং এর ফলে দেহে নারীসুলভ কোমনীয়তা আসে।
৮। জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনি ইত্যাদি অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।

ছেলেদের বয়োঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

১। দ্রুত ওজন ও উচ্চতা বাড়ে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
২। সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৩। স্বরথলির বৃদ্ধি ও ভোকাল কর্ডের পরিবর্তনের কারণে কণ্ঠস্বর ভারী ও গভীর হয়।
৪। জননাঙ্গের সেমিনাল ভেসিকল, প্রোস্টেট গ্রন্থি ও কওপার গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে এবং এদের নিঃসরণ শুরু হয়।
৫। সেমিনাল ফ্লুইডে ফ্রুক্টোজের আবির্ভাব ঘটে।
৬। লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বীর্যপাত ঘটে, স্বপ্নদোষ হয়।
৭। দাঁড়ি, গোঁফ, বুকের লোম, বগলের লোম ও পিউবিক লোম গজানো শুরু হয়।
৮। তৈল গ্রন্থির অধিক নিঃসরণের কারণে মুখমণ্ডল চকচকে দেখায় এবং ব্রণ (acne) বিকশিত হতে দেখা যায়।

বয়োঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিবর্তন

১। যৌনতা সম্পর্কে কৌতুহল জাগে, যৌন বিষয়ক চিন্তা করার প্রবণতা বাড়ে।
২। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
৩। লজ্জাবোধ জাগে, আবেগপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পরে।
৪। আত্মসচেতনতা বাড়ে।
৫। ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন হয়, কেউ কেউ একা একা থাকতে পছন্দ করে আবার কারো কারো অনেক বন্ধুবান্ধব হয়।
৬। চেহারা, সাজগোজ, পোষাক, আচার-আচরণের ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠে।
৭। মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, হতাশা, চাঞ্চল্য ভাব ও মনে নানা প্রশ্ন জন্মায়।
৮। নিজেকে পূর্ণবয়স্ক ভাবতে শুরু করে, স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা আসে।
৯। বয়স্কদের অনুকরণ করতে শুরু করে।

CamScanner

বয়োঃসন্ধিকালে করণীয়

বয়োঃসন্ধি ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জন্য বেশ খানিকটা সংকটের সৃষ্টি করে বা সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তাই এ সময়ে সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত নজর দিতে হবে। এ সময় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সময়মত খাবার না খাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঘরের খাবারের চেয়ে বাইরের খাবারের প্রতি তাদের বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ছেলে-মেয়েদের যতটা সম্ভব বাসায় তৈরি সবুজ শাক-সবজি, ফলমূল, সামুদ্রিক মাছ, দুধ ও ডিম খাওয়াতে হবে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা, মানসিক পরিবর্তন ও আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও সে রকম প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে হলেও কৈশোর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও এটি আরো ব্যাপকভাবে শুরু করা প্রয়োজন। আমাদের অভিভাবকরাও এ বিষয়গুলোর উপর ভালো বই তাদের সন্তানদের পড়তে বলতে পারেন বা নিজেরা তা পড়ে সন্তানদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

২। রজঃচক্র (Menstrual cycle)

বয়োঃসন্ধিকালের পর থেকে অর্থাৎ যৌনতা প্রাপ্তির পর থেকে স্ত্রীজনন অঙ্গসমূহে যেসব নিয়মিত পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তাকে স্ত্রী যৌনচক্র বলে। এ চক্র প্রজননের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। গর্ভধারণকালীন সময়ে এ চক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন স্ত্রী যৌনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষদের কোনো যৌনচক্র থাকে না। এজন্য পুরুষের সমগ্র যৌন জীবনব্যাপী জননশীলতা সমভাবে সক্রিয় থাকে। যৌন চক্রের সময় স্ত্রী জননতন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গেই কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় তবে ডিম্বাশয় ও জরায়ুর পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রী যৌনচক্রের সময় জরায়ুর প্রাচীরে যেসব ধারাবাহিক ও চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে তাকে জরায়ু চক্র (uterine cycle) বলে। প্রতিবার জরায়ুচক্র শেষে রক্তসহ মিউকাস ও অন্যান্য পদার্থ যোনিপথে বের হয়ে যায়। একে রজঃস্রাব (menstruation) বলে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটি জরায়ু চক্র শেষে রজঃস্রাব সংঘটিত হওয়াকে রজঃচক্র (menstrual cycle) বলে। রজঃচক্রকে তিনটি প্রধান দশায় ভাগ করা হয়, যথা-

(ক) প্রোলিফারেটিভ দশা (Proliferative phase): পূর্ববর্তী রজঃচক্রের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে জরায়ুর প্রাচীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর্যায়কে প্রোলিফারেটিভ দশা বলে। এ দশার সময়কাল প্রায় 10 দিন। এসময় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীর ক্রমান্বয়ে পুরু হতে থাকে এবং এতে বিদ্যমান নলাকার গ্রন্থি ও রক্তনালি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রোলিফারেটিভ দশার শুরুতে এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীরের পুরুত্ব 2 মিলিমিটার থাকে কিন্তু দশার শেষে উহা 4 মিলিমিটার হয়। এসময় হাইপোথ্যালামাসের gonadotrophin releasing hormone (GnRH) এর প্রভাবে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে follicle stimulating hormone (FSH) ক্ষরিত হয়। FSH-এর প্রভাবে ডিম্বাশয়ে প্রিমোর্ডিয়াল ফলিকল বিকশিত হতে শুরু করে এবং বর্ধনশীল ফলিকল ক্ষরিত ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর প্রাচীরের এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

(খ) সিক্রেটরি দশা (Secretory phase): ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের প্রাচীর ভেঙ্গে পরিপক্ক ডিম্বাণু বা সেকেন্ডারি উওসাইট বের হয়ে আসাকে ওভ্যুলেশন বলে। ওভ্যুলেশনের সময় luetenizing hormone এবং follicle stimulizing hormone এর ক্ষরণ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছায়। ডিম্বাশয়ের ওভ্যুলেশন দশা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে জরায়ুর সিক্রেটরি দশা শুরু হয় এবং 14 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসময় এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীর অধিক পুরুত্ব (প্রায় 8 মিলিমিটার) লাভ করে এবং এর প্রাচীরের নিঃস্রাবী গ্রন্থিগুলো আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তরল দ্বারা পূর্ণ হয়। ধমনিসমূহ অধিক কুণ্ডলিত ও সুস্পষ্ট হয়। এসময় এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীর থেকে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস নিঃসৃত হয়।

(গ) ব্লিডিং দশা (Bleeding phase): গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণু বের হয়ে যাওয়ার পর ক্ষয়প্রাপ্ত ফলিকল সংঘটিত হয়ে কর্পাস লুটিয়াম (corpus luteum) গঠন করে। এটি আকারে 1.5 সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট হয় এবং

CamScanner

হলুদ বর্ণের ও লিপিড দানা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কর্পাস লুটিয়াম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে এবং এটি হতে estrogen, prostaglandin ও progesteron hormone ক্ষরিত হয়।

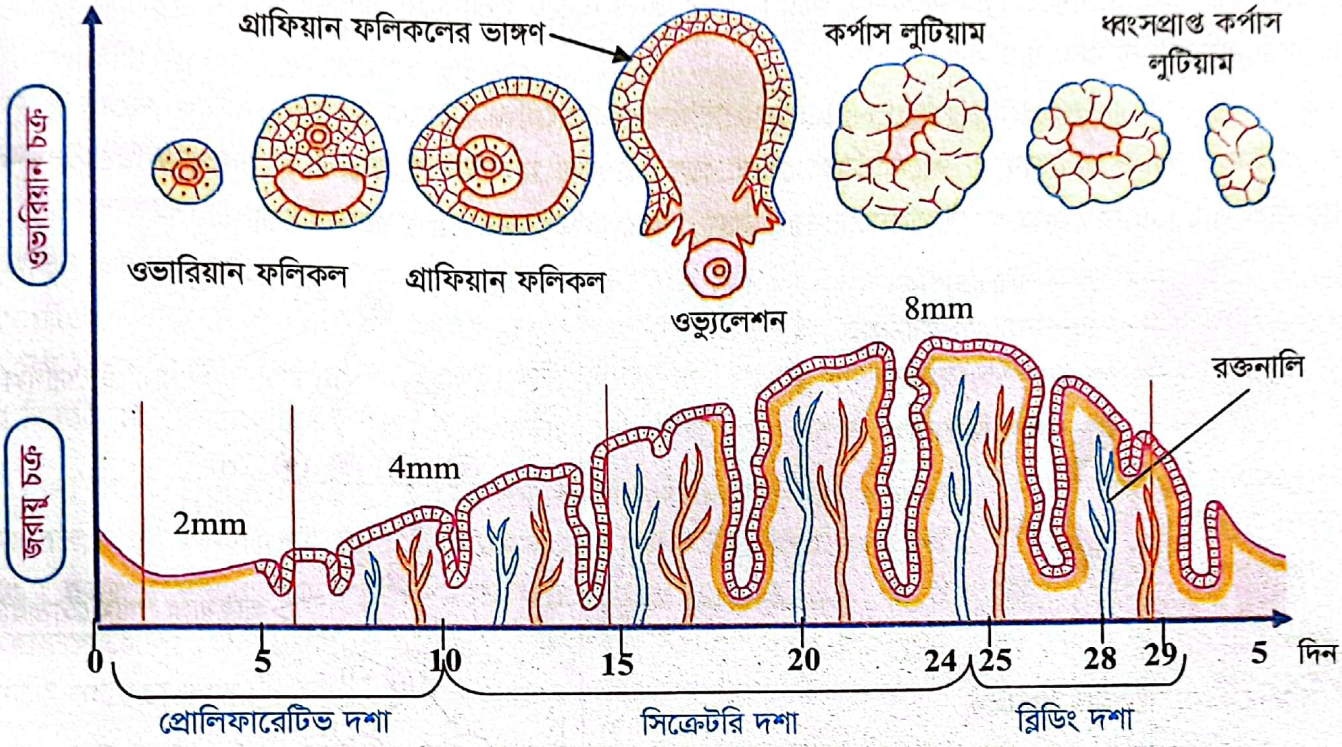

চিত্র ৯.৩ মানুষের যৌনচক্রের সময় বিভিন্ন পরিবর্তন

ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে স্ত্রী যৌন চক্রের 26 তম দিনে কর্পাস লুটিয়াম চুপসে যায় এবং এদের হরমোন ক্ষরণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। হরমোনাল সমর্থন না থাকায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীর কুঞ্চিত হতে থাকে এবং এর রক্তনালিগুলো অধিক মাত্রায় কুণ্ডলিত হয়ে অবশেষে ফেটে যায়। এসময় এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে যায়। এতে 30-40 মিলিলিটার রক্ত ক্ষরণ ঘটে। এসব রক্ত মিউকাস ও অন্যান্য পদার্থের সাথে মিশে যোনিপথে বের হয়ে যায়। এ অবস্থা 4-5 দিনব্যাপি চলে।

রজঃচক্রের তাৎপর্য

(১) রজঃচক্র মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার সূচনা ঘটায়।
(২) এচক্র স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণ ক্ষমতা নির্দেশ করে।
(৩) এচক্র প্রতিমাসে একবার গর্ভসঞ্চারণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
(৪) নিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের যৌন সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ করে।
(৫) অনিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের যৌন সমস্যা সৃষ্টি করে।

৩। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি (Gametogenesis)

যৌন জননক্ষম মানুষের গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্যামিটোজেনেসিস বলে। গ্রিক *gamos*-জননকোষ এবং *genesis*-উৎপত্তি হওয়া-এর সমন্বয়ে gametogenesis শব্দটি গঠিত। যৌন জননক্ষম পরিণত পুরুষের শুক্রাশয় এবং স্ত্রীর ডিম্বাশয়ে বিদ্যমান জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকে গ্যামিটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। গ্যামিটোজেনেসিস দুপ্রকার, যথা- স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিস।

■ শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis: Gr. *sperma*=শুক্রাণু+*genesis*=জনন বা সৃষ্টি)

যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম পুরুষের শুক্রাশয় থেকে স্পার্ম বা শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। পুরুষের প্রতিটি শুক্রাশয় অসংখ্য সেমিনিফেরাস নালিকা নিয়ে গঠিত। এসব নালিকার

অন্তঃপ্রাচীর জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। এসব জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ থেকেই শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সোমাটিক কোষ থাকে, এদের সার্টলি কোষ (sertoly cell) বলে। এরা বর্ধনশীল শুক্রাণুতে পুষ্টি সরবরাহ করে। শুক্রাণুজনন একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত চারটি শিরোনামে বর্ণনা করা যায় -

১। সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase): জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যেসব কোষ থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাদের প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ বা প্রিমোর্ডিয়াল কোষ বলে। এগুলো মাইটোসিস পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এসব কোষকে স্পার্মাটোগোনিয়া বলে। এগুলো ডিপ্লয়েড (2n) ধরনের কোষ।

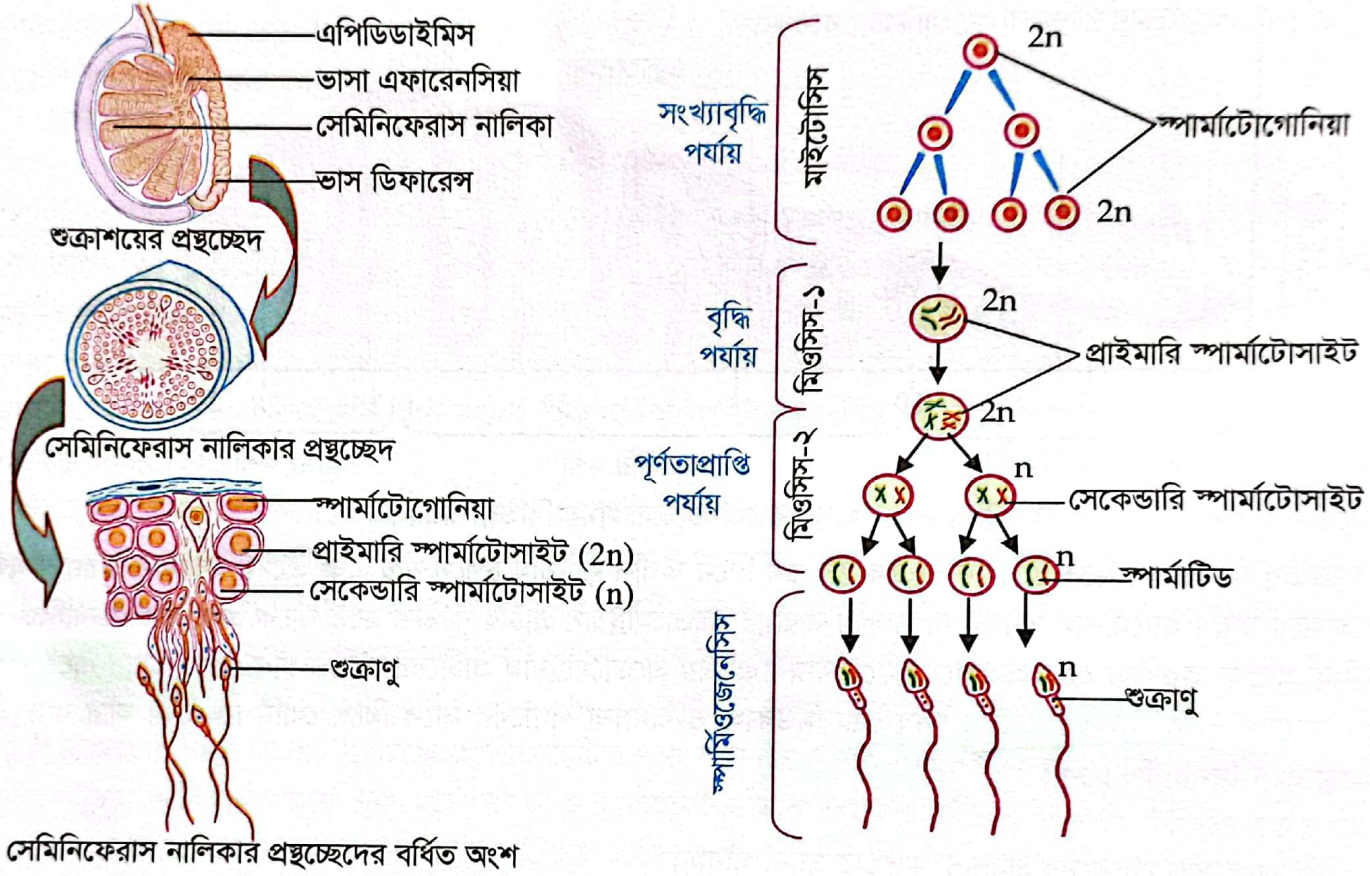

চিত্র ৯.৪ মানুষের শুক্রাণুজননের বিভিন্ন পর্যায়

২। বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase): বৃদ্ধি পর্যায়ে স্পার্মাটোগোনিয়াগুলো বিপুল পরিমাণ পুষ্টি পদার্থ ও ক্রোমাটিন বস্তু সঞ্চয় করে আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় এদেরকে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট বলে।

৩। পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase): এ পর্যায়ের প্রথমে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলোতে প্রথম মিওসিস বিভাজন ঘটে। এর ফলে সৃষ্ট কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট বলে। এদের প্রতিটি দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি করে স্পার্মাটিড (spermatid) গঠন করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড (n) গঠিত হয়।

৪। স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis): যে জটিল প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠন করে তাকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে। এসময় নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়:

- নিশ্চল, গোলাকার ও বিপুল সাইটোপ্লাজমযুক্ত স্পার্মাটিড পরিবর্তিত হয়ে সচল, লম্বাকৃতির ও প্রায় সাইটোপ্লাজমবিহীন শুক্রাণু গঠন করে।

CamScanner

- স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিওলাস পরিত্যাগ করে সঙ্কোচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে।
- স্পার্মাটিডের গলগি বস্তু থেকে অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে।
- স্পার্মাটিডের মাইট্রোকন্ড্রিয়া সর্পিলভাবে পেঁচিয়ে শুক্রাণুর মধ্যাংশ গঠন করে।
- স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে।

শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে 60-70 দিন সময় লাগে। এপিডিডাইমাসে শুক্রাণুগুলো জমা থাকে এবং কার্যাপোযোগী পরিপক্কতা লাভ করে।

শুক্রাণুর অঙ্গসংস্থান (Morphology of a sperm)

বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর আকার ও আকৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। শুক্রাণুর আকৃতি প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific)। প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু আণুবীক্ষণিক, সরু, দীর্ঘাকার ও লম্বা লেজ বিশিষ্ট। মানবদেহের সবচেয়ে সবচেয়ে ছোট কোষ হলো শুক্রাণু। মানুষের শুক্রাণুর ব্যাস 2.5 মাইক্রন এবং দৈর্ঘ্য প্রায় 50 মাইক্রন। এদের দেহ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা -(ক) মস্তক, (খ) গ্রীবা ও (গ) লেজ।

(ক) মস্তক (Head): শুক্রাণুর দেহের সম্মুখের উপবৃত্তাকার অংশকে মাথা বা মস্তক বলে। এর অধিকাংশই হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোম বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস দ্বারা পূর্ণ থাকে। শুক্রাণুর মাথার সামনে টুপির মতো অ্যাক্রোসোম (acrosome) থাকে যা হায়ালোরোনিডেজ (hyaluronidase) এনজাইম নিঃসরণ করে শুক্রাণুকে নিষেকে সহায়তা করে।

(খ) গ্রীবা (Neck): শুক্রাণুর মাথার পেছনে সরু, সঙ্কোচিত অংশকে গ্রীবা বলে। এতে সেন্ট্রিওল অবস্থান করে।

(গ) লেজ (Tail): গ্রীবার পেছনে অবস্থিত লম্বা, সরু অংশই হলো লেজ। লেজের সম্মুখ দিকে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে যাদের একটি থেকে অক্ষীয় সূত্রক (axial filament) সৃষ্টি হয়ে লেজের পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। লেজের গোড়ার দিকে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো অক্ষীয় সূত্রককে সর্পিলভাবে প্যাঁচিয়ে থেকে শুক্রাণুর মধ্যাংশ গঠন করে। লেজের শেষপ্রান্তের অক্ষীয় সূত্রক ছাড়া সমগ্র শুক্রাণুর দেহই কোষ আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে।

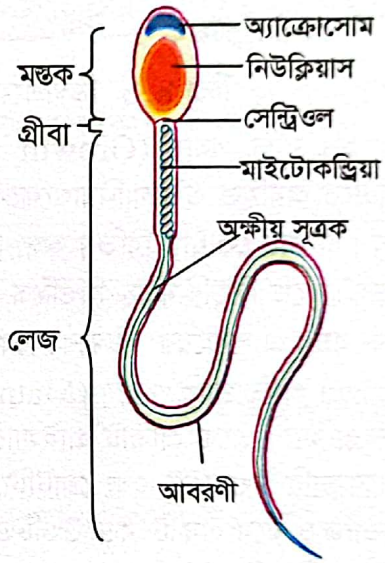

চিত্র ৯.৫ মানুষের শুক্রাণু

স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিস-এর মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস	স্পার্মিওজেনেসিস
১। শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।	১। স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণু সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।
২। কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, বৃদ্ধি, পুর্ণতা প্রাপ্তি ও রূপান্তর ঘটে।	২। কেবল কোষের আকারের ব্যাপক রূপান্তর ঘটে।
৩। গ্যামিটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার একটি কৌশল।	৩। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার একটি কৌশল।
৪। দীর্ঘ সময়ব্যাপি সংঘটিত হয়।	৪। দ্রুত সংঘটিত হয়।

ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস (Oogenesis: গ্রিক *Oon* = ডিম্বাণু এবং *genesis* = সৃষ্টি)

যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাকে ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস বলে। মহিলাদের ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ থেকে উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত চারটি ধাপে সংঘটিত হয়:

CamScanner

১। সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase): এ পর্যায়ে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের কিছু প্রাইমারি জার্মিনাল কোষ বা প্রিমোর্ডিয়াল কোষ পুনঃপুনঃ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এভাবে উৎপন্ন কোষগুলোকে উওগোনিয়া (oogonia) বলে। এরা ডিপ্লয়েড (2n) প্রকৃতির ।

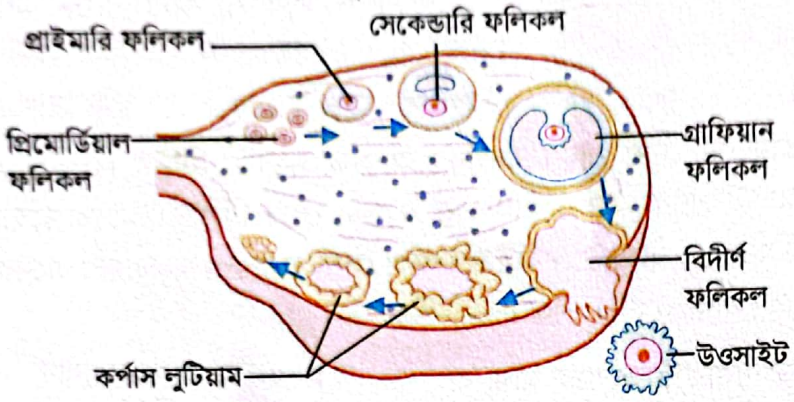

চিত্র ৯.৬ ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণুজনন

২। বৃদ্ধি পর্যায় (Growth phase): এ পর্যায়ে ডিম্বাশয়ের প্রাচীরে অবস্থিত উওগোনিয়াগুলো পুষ্টিলাভ করে আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এসময় কোষীয় বিভিন্ন অঙ্গাণুর সংশ্লেষণ ঘটে। আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে নিউক্লিয়াসে মিওসিস বিভাজনের প্রথম প্রোফেজ দশা শুরু হয়। এ পর্যায়ের ডিম্বকোষকে প্রাইমারি উওসাইট বলে।

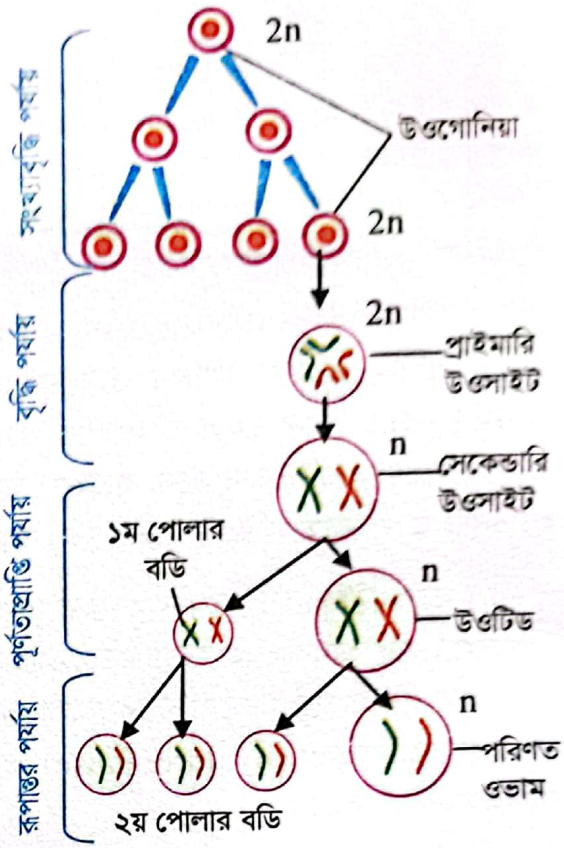

চিত্র ৯.৭ মানুষের ডিম্বাণুজনন

৩। পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase): এ পর্যায়ের শুরুতে প্রাইমারি উওসাইটের প্রথম মিওসিস বিভাজন সম্পন্ন হয়। এতে প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে দুটি অসম আকৃতির হ্যাপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয়। এদের বড়টিকে সেকেন্ডারি উওসাইট এবং ছোটটিকে পোলার বডি বলে। দ্বিতীয় মিওসিস বিভাজনে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভাজিত হয়ে একটি বড় উওটিড ও একটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি করে। প্রথম মিওসিসে উৎপন্ন পোলার বডিটিও এসময় বিভাজিত হয়ে দুটি পোলার বডি সৃষ্টি করে।

উওটিড ও পোলার বডি সকলেই হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি বৃহৎ উওটিড ও তিনটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি হয়।

৪। রূপান্তর পর্যায় (Metamorphosis phase): এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে ওভাম (ovum) বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মতো এক্ষেত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভেতরের বস্তুসমূহের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। পোলার বডিসমূহ বিনষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়।

কেবল ভ্রূণীয় দশায় মহিলাদের ডিম্বাশয়ে 6 থেকে 7 মিলিয়ন ডিম্বাণু তৈরি হয়, কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কেবল 1 মিলিয়ন জীবিত থাকে। শিশু জন্মের পরও ডিম্বাণুর মৃত্যু চলতে থাকে এবং বয়োঃসন্ধিকালে পৌছানোর সময় মাত্র 0.3 মিলিয়ন ডিম্বাণু জীবিত থাকে। এদের মধ্যে মাত্র 400 ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

ডিম্বাণুর অঙ্গসংস্থান (Morphology of ovum)

যৌন জননকারী প্রাণীর স্ত্রী জননকোষের নাম ডিম্বাণু। মানুষের ডিম্বাণু অতি ক্ষুদ্র, আকারে প্রায় 0.2 মিলিমিটার এবং ডিম্বাশয়ের ফলিকলে আবদ্ধ থাকে। স্তন্যপায়ীর/মানুষের একটি ডিম্বাণু নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

১। আবরণী: ডিম্বাণুতে তিন ধরনের আবরণী দেখা যায়, যেমন-

(ক) ভাইটেলিন আবরণী: সকল ডিম্বাণুই একটি প্লাজমা আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। একে ভাইটেলিন আবরণী (vitelline membrane) বলে।

CamScanner

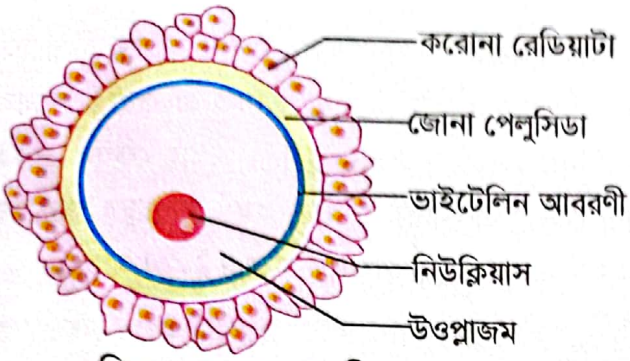

চিত্রঃ ৯.৮ মানুষের ডিম্বাণু

(খ) মুখ্য আবরণীঃ ডিম্বাশয়ে থাকাকালীন সময়ে এ আবরণী গঠিত হয়। এটি সংরক্ষণমূলক আবরণী। বিভিন্ন প্রাণীতে এ আবরণী বিভিন্ন নামে পরিচিত। স্তন্যপায়ীদের এ আবরণীকে জোনা পেলুসিডা (zona pelucida) বলে।

(গ) গৌণ আবরণীঃ ডিম্বনালি দিয়ে বের হওয়ার সময় ডিম্বাণুতে এ আবরণী সংযোজিত হয়। উভচরদের এ আবরণী জেলির মতো। পাখিদের ক্ষেত্রে এটি জটিল ও চার স্তর বিশিষ্ট। স্তন্যপায়ীদের এটিকে করোনা রেডিয়াটা (corona radiata) বলে।

২। উওপ্লাজম ও ডিওটারোপ্লাজমঃ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে উওপ্লাজম (ooplasm) বলে। এতে সকল ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুই বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কুসুম বা ডিওটারোপ্লাজম (deuteroplasm) থাকে যার উপর ডিম্বাণুর আকার নির্ভর করে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণুতে কুসুম থাকে না বলে এরা আণুবীক্ষণিক।

৩। নিউক্লিয়াসঃ ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটি গোলাকার। এতে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস	উওজেনেসিস
১। এ প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয় থেকে অসংখ্য শুক্রাণু সৃষ্টি হয়।	১। এ প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয় থেকে একটি বা কয়েকটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।
২। এতে স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের উল্লেখযোগ্য কোনো বৃদ্ধি ঘটে না।	২। এতে উওসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ঘটে।
৩। এতে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড (n) সৃষ্টি হয়।	৩। এতে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি উওসাইট (2n) থেকে একটি বৃহৎ, হ্যাপ্লয়েড উওটিড (n) ও তিনটি ক্ষুদ্র হ্যাপ্লয়েড পোলার বডি (n) সৃষ্টি হয়।
৪। স্পার্মাটিড আকারে পরিবর্তিত হয় এবং অনেক সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু পরিত্যাগ করে শুক্রাণুতে পরিণত হয়।	৪। উওটিড আকারে পরিবর্তিত হয় না কিন্তু অনেক সাইটোপ্লাজমীয় বস্তুর সংশ্লেষ হয়।
৫। স্পার্মাটোজেনেসিসে শুক্রাণুর মস্তকের সামনে অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি হয়, কোনো আবরণী সৃষ্টি হয় না।	৫। উওজেনেসিসে অ্যাক্রোসোম সৃষ্টি হয় না, ডিম্বাণুর চারদিকে মুখ্য ও গৌণ আবরণী গঠিত হয়।

গ্যামিটোজেনেসিসের গুরুত্ব

১। গ্যামিটোজেনেসিসের ফলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় যা মানুষের যৌন জননের জন্য অপরিহার্য।

২। গ্যামিটোজেনেসিসে মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের মিলনে জাইগোটে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম সংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে গ্যামিটোজেনেসিস দ্বারা জীবদেহে ক্রোমোসোম সংখ্যা বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।

৩। গ্যামিটোজেনেসিসের মিওসিস কোষ বিভাজনের সময় ক্রসিং ওভার ঘটে, ফলে জীবে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

CamScanner

৪। নিষেক (Fertilization)

যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে এদের হ্যপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোমবাহী নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটিয়ে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম বিশিষ্ট জাইগোট গঠন করে তাকে নিষেক বলে। নিষেক একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া। নিষেক ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেক প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific) অর্থাৎ কেবল একই প্রজাতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে নিষেক ঘটে। ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা কেবল একবারই নিষিক্ত হয়। মানুষের শুক্রাণুর আয়ুষ্কাল মাত্র আড়াই মাস, তবে প্রক্ষেপণের পর এরা বাঁচে মাত্র 1-3 দিন। ডিম্বাণুর আয়ুষ্কাল মাত্র 12-24 ঘণ্টা।

মানুষের নিষেক স্ত্রীর ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালিতে সংঘটিত হয়। যৌন মিলনের সময় বীর্যের (semen) সাথে অসংখ্য শুক্রাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে কিন্তু কেবল একটি শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় সফল হয়। প্রতিবার সঙ্গমে 1.5- 4 মিলিলিটার বীর্য ক্ষরিত হয় এবং এতে প্রায় 40-100 মিলিয়ন (4-10 কোটি) শুক্রাণু থাকে। কিন্তু মাত্র 1টি শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে। যৌন মিলনের 24 ঘণ্টার মধ্যে নিষেক সংঘটিত না হলে শুক্রাণু মারা যায়।

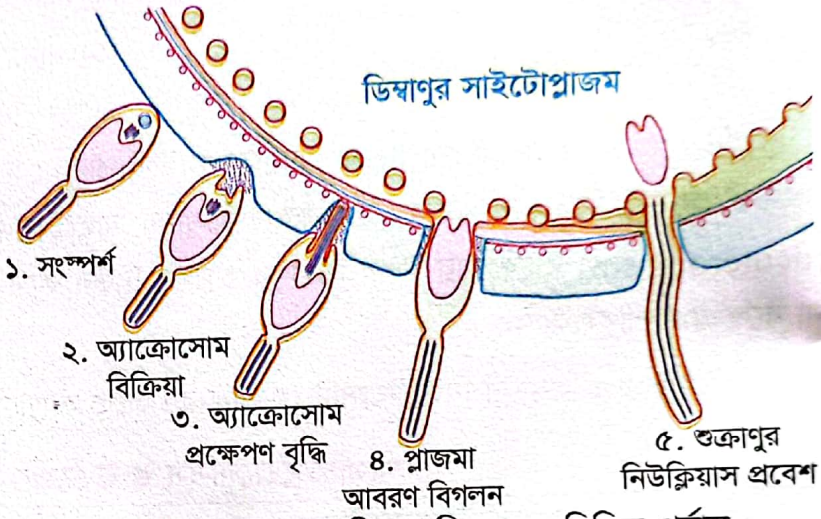

চিত্র ৯.৯ মানব ডিম্বাণু নিষেকের বিভিন্ন পর্যায়

নিষেকের ফলাফল (Results of fertilization)

নিষেকের ফলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। জাইগোটে হ্যাপ্লয়েড পুং ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন উপাদানের বিস্তৃতি ঘটে এবং ডিম্বাণুর গোলাকার ধারণ করার প্রবণতা দেখায়। নিষেকের ফলে ডিম্বাণুর বিভিন্ন আবরণীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে প্রোটিনের দ্রবণীয়তা, ভেদ্যতা ও বিপাক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। নিষেকের ফলে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম ও কুসুমের বিস্তৃতি ও বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization):

১। নিষেক জীবের ডিপ্লয়েড সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
২। নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়।
৩। নিষেক পিতা ও মাতার বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে।
৪। নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের নতুন সমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবে প্রকরণের সূচনা হয়।
৫। নিষেক ডিম্বাণুর বিপাক হার ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।
৬। নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।
৭। নিষেক জীবের বংশ রক্ষার ও ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৫। জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপন বা ইমপ্লানটেশন (Implantation)

বর্ধনশীল মানব ভ্রূণ জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়ার কৌশলকে ইমপ্লানটেশন বলে। নিষেকের 7-8 দিনের মধ্যে ভ্রূণ জরায়ুর পৃষ্ঠদিকের এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়। ইমপ্লানটেশনের সময় ভ্রূণ যে অবস্থায় থাকে তাকে ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst) বলে। এর বহিঃতলে ট্রফোব্লাস্ট (trophoblast) নামক কোষের ক্রিয়ায় ভ্রূণ জরায়ুতে সংস্থাপিত হয়।

CamScanner

ইমপ্লানটেশন প্রক্রিয়া

১। নিষেকের পরবর্তী 72 ঘণ্টা পর্যন্ত জাইগোটে 4/5 বার মাইটোটিক বিভাজন ঘটে (ক্লিভেজ) এবং এটি একটি ক্ষুদ্র নিরেট কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। একে মরুলা বলে। মরুলার কোষসমূহকে (12-16টি) ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) বলে।

২। ডিম্বনালির অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়ার আন্দোলনে মরুলা জরায়ুতে প্রবেশ করে। শীঘ্রই মরুলা রূপান্তরিত হয়ে একটি **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst) গঠন করে। এর অভ্যন্তরে তরলপূর্ণ গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** এবং বাইরের একস্তরী প্রাচীরকে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast) বলে। ব্লাস্টোসিলের এক পার্শ্বে **এমব্রায়োব্লাস্ট** (embryoblast) নামক কতগুলো কোষ থাকে যেগুলো থেকে ভ্রূণের মূলদেহ গঠিত হয়।

৩। মরুলা জরায়ুতে প্রবেশের দুই দিনের মধ্যে ভ্রূণের জোনা পেলুসিডা বিলুপ্ত হয় এবং ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াল এপিথেলিয়ামের সাথে সংযুক্ত হয়।

৪। ব্লাস্টোসিস্ট সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এর ট্রফোব্লাস্ট দ্রুত বিভাজিত হতে থাকে এবং ক্রমে দুটি স্তর গঠন করে। এর ভেতরের দিকের স্তরকে **সাইটোট্রফোব্লাস্ট** (cytotrophoblast) এবং বাইরের দিকের স্তরকে **সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট** (syncyteotrophoblast) বলা হয়।

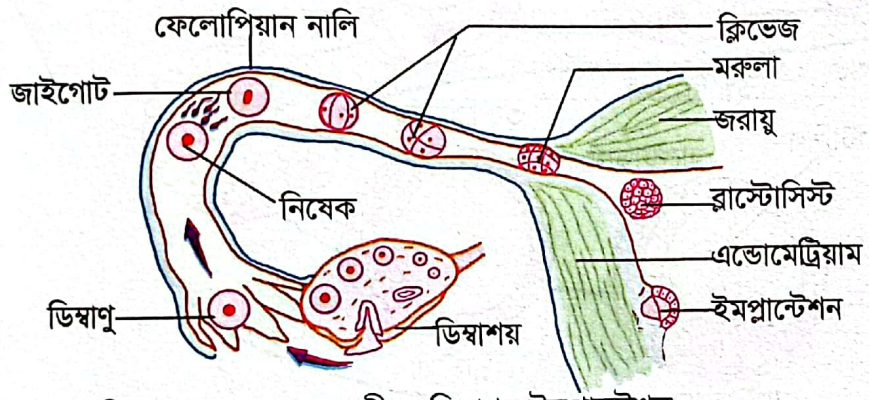

চিত্র ৯.১০ জরায়ুর প্রাচীরে ডিম্বাণুর ইমপ্লান্টেশন

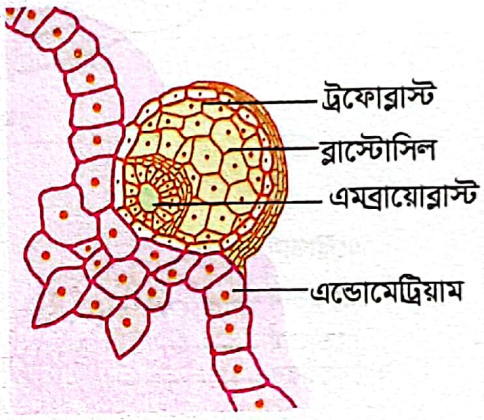

চিত্র ৯.১১ একটি ব্লাস্টোসিস্ট

৫। সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট-এর কোষগুলো দ্রুত জরায়ু প্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়াল এপিথেলিয়াম ও এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমা স্তরে প্রবেশ করে।

৬। সাতদিনের মধ্যে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর ব্লাস্টোসিস্টকে বাইরে থেকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলে এবং এভাবে ইমপ্লানটেশন সম্পন্ন হয়।

৭। ইমপ্লানটেশনের পর ট্রফোব্লাস্ট দ্রুত বিভাজিত ও পুরু হয়ে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াল প্রাচীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র কোরিওনিক ভিলাই (chorionic villi) ও অ্যামনিয়ন আবরণ (amnionic membrane) গঠন করে।

৬। ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া (Formation of embryo) বা এমব্রায়োজেনেসিস (Embryogenesis)

নিষেকে সৃষ্ট জাইগোট ভ্রূণে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে এমব্রায়োজেনেসিস বলে। প্রতিটি মানুষ তার জীবন চক্রে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় এককোষী (জাইগোট) অবস্থায় থাকে। এরপর এটি ভ্রূণ গঠন শুরু করে। মানুষের ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া ক্লিভেজ, গ্যাস্ট্রুলেশন ও অর্গানোজেনেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

(ক) ক্লিভেজ (Cleavage)

যে পদ্ধতিতে জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) বলে। ক্লিভেজ পদ্ধতিতে ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। একে মরুলা (morula) বলে। ক্রমে

CamScanner

মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভেতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে ব্লাস্টুলা (blastula) বলে। ব্লাস্টুলার কোষস্তরকে ব্লাস্টোডার্ম (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (blastocoel) বলে। ভ্রূণ ব্লাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

(খ) গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation)

ব্লাস্টুলা বিকশিত হয়ে ভ্রূণের পরবর্তী দশা গ্যাস্ট্রুলা গঠন করে। যে প্রক্রিয়ার ব্লাস্টুলা থেকে গ্যাস্ট্রুলা গঠিত হয় তাকে গ্যাস্ট্রুলেশন বলে। গ্যাস্ট্রুলেশন হলো প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের একটি অতি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল দশা যাতে ব্লাস্টুলার একস্তরে সজ্জিত কোষগুলো দুস্তরে সজ্জিত হয়। দুস্তরের বাইরেরটি এক্টোডার্ম (ectoderm) এবং ভেতরেরটি এন্ডোডার্ম (endoderm) নামে পরিচিত।

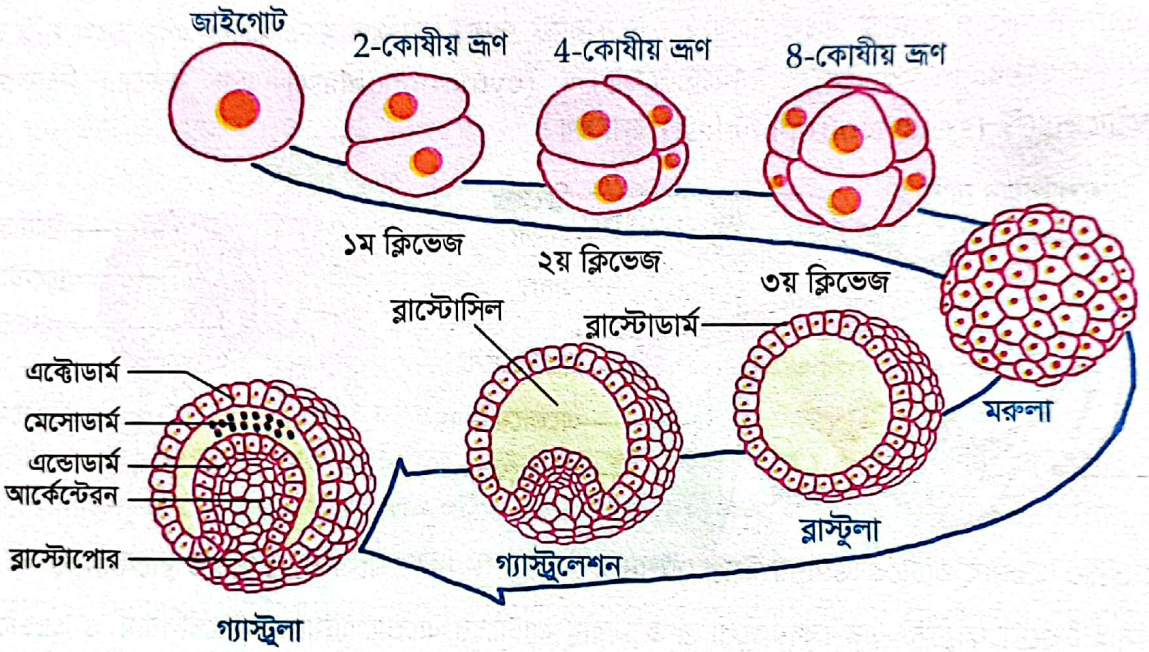

চিত্র ৯.১২ মানুষের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশা

পরবর্তীতে এন্ডোডার্ম থেকে মেসোডার্ম নামের আরেকটি স্তর গঠিত হয়। ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশায় বিদ্যমান এসব স্তরকে ভ্রূণীয় স্তর বা জার্ম লেয়ার (germ layer) বলে। গ্যাস্ট্রুলার ভেতরের তরলপূর্ণ গহ্বরকে আর্কেন্টেরন (archenteron) বলে। এটি একটি ছিদ্র দ্বারা বাইরে মুক্ত হয়। এ ছিদ্রকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) বলে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় ব্লাস্টুলার কোষসমূহ বা ব্লাস্টুমিয়ারের বিচলনের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রুলা গঠিত হয় এবং প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ তথা সামগ্রিক গঠনের রূপরেখা স্থাপিত হয়।

(গ) অর্গানোজেনেসিস (Organogenesis)

গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট বিভিন্ন ভ্রূণীয়স্তর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ বা অঙ্গ গঠন করার প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে। একটি ভ্রূণীয় স্তর বা তার কোনো অংশ দেহের একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গ গঠনের দায়িত্বে পূর্ব হতে নিয়োজিত থাকে না। প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণীয় স্তরগুলো একাধিক কাজ করার ক্ষমতা রাখে। তবে এ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রহিত হয়। ভ্রূণীয় স্তরের কোনো কোষপুঞ্জ একবার একটি অঙ্গের গঠন প্রক্রিয়া শুরু করলে সে কোষপুঞ্জ সে নির্দিষ্ট অঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ গঠনে আর সমর্থ হয় না। দেহের অনেক অঙ্গ বা অঙ্গ গঠনে একাধিক ভ্রূণীয় স্তর অংশগ্রহণ করে। প্রথমে ভ্রূণীয় স্তর থেকে ছোট ছোট কোষপিণ্ড আলাদা হয়ে প্রাথমিক অঙ্গকুঁড়ি (primary organ rudiment) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

CamScanner

৯। ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (Development of embryo and fetus)

জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে ভ্রূণ (embryo) এবং এর পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে ফিটাস (fetus) বলে। মায়ের জরায়ুর ভেতরে ভ্রূণ ও ফিটাস বিকশিত হয়। মাতৃগর্ভে শিশু প্রায় 9 মাস বা 36-38 সপ্তাহ থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। এসময় যেসব পরিবর্তন ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

প্রথম মাস	নিষিক্ত ডিম্বাণু বিভাজিত হয়ে প্রথমে ভ্রূণীয় স্তর এবং পরবর্তীতে প্রাথমিক অঙ্গকুঁড়ি গঠন করে। এসময় ভ্রূণের চারদিকে বিভিন্ন বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি (কুসুম থলি, অ্যামনিওন, অ্যালানটয়িক স্যাক ও কোরিয়ন) সৃষ্টি হয়। শেষের দিকে অমরা (placenta), নাভি রজ্জু (umbilical cord), নিউরাল নালি (neural tube) ও দেহখণ্ডক বিকশিত হয়। এসময় ভ্রূণ ¼ সেন্টিমিটার লম্বা হয়।
দ্বিতীয় মাস	মাথার পাশে চামড়া ভাঁজ খেয়ে কানের সৃষ্টি করে। নিউরাল নালি অধিক বিকশিত হয়। হাত ও পা কুঁড়ির মতো বিকশিত হয়। ভ্রূণে একটি লেজ ও গলায় ফুলকা রন্ধ্র দেখা যায়। এসময় ভ্রূণ 1 ইঞ্চি লম্বা ও 1/30 আউন্স ওজন বিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকের শিশুকে ফিটাস বলে।
তৃতীয় মাস	ফিটাসের হাত ও পায়ের আঙ্গুল পূর্ণ বিকশিত হয়। প্রজনন অঙ্গ গঠিত হয়। তৃতীয় মাসের শেষের দিকে শিশু 4 ইঞ্চি লম্বা ও 1 আউন্স ওজন বিশিষ্ট হয়।

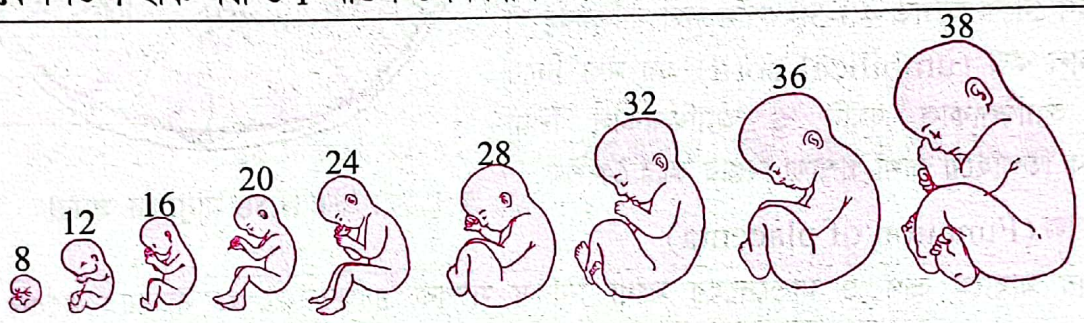

চিত্র ৯.১৩ মানুষের ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (সপ্তাহ)

চতুর্থ মাস	শিশুর চোখের পাতা ও ভ্রু, নখ ও চুল বিকশিত হয়। স্নায়ুতন্ত্র কাজ শুরু করে। হাত ও পায়ের সঞ্চালন শুরু হয়। বৃদ্ধাঙ্গুল চুষতে পারে। এসময় শিশু 6 ইঞ্চি লম্বা ও 4 আউন্স ওজন বিশিষ্ট হয়।
পঞ্চম মাস	শিশুর মাথায় চুল গজায়। শিশুর ত্বক লানুগো (lanugo) নামক পাতলা ও নরম চুল দ্বারা আবৃত থাকে। পঞ্চম মাসের শেষ দিকে শিশু 10 ইঞ্চি লম্বা ও 1/2 থেকে 1 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
ষষ্ঠ মাস	শিশুর ত্বক লালচে বর্ণ ধারণ করে, কুঁচকানো এবং ত্বকে শিরা দৃষ্টিগোচর হয়। ফিঙ্গার প্রিন্ট দেখা যায়। চোখের পাতা খুলতে শুরু করে। এসময় শিশু 12 ইঞ্চি লম্বা ও 2 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
সপ্তম মাস	শিশুর দেহে চর্বি সঞ্চিত হতে থাকে। শ্রবণ অঙ্গ পূর্ণ বিকশিত হয়। এসময় শিশু প্রায়শই অবস্থান পরিবর্তন করে এবং শব্দ, ব্যথা ও আলোর প্রতি সাড়া দেয়। শিশু 14 ইঞ্চি লম্বা ও 2-4 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
অষ্টম মাস	এসময় শিশু দেহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শিশু দেখতে শুনতে পারে। ফুসফুস ব্যতিত দেহের সকল অন্তঃঅঙ্গ বিকশিত হয়। এসময় শিশু 18 ইঞ্চি লম্বা ও 5 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয়।
নবম মাস	ফুসফুস পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এসময় প্রতিবর্ত ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় ঘটে ফলে শিশু চোখ মিট মিট করা, মাথা ঘুরানো, আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করা এবং শব্দ, আলো ও স্পর্শের প্রতি সাড়া দেয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্থ হয়। এসময় শিশু আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় 20 ইঞ্চি লম্বা ও 7 পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট হয় এবং পৃথিবীতে আসার উপযোগী হয়।

CamScanner

অমরা (Placenta)

অমরা বা প্লাসেন্টা হলো মাতৃকলা ও ভ্রূণকলা নিয়ে গঠিত অস্থায়ী অঙ্গ যার মাধ্যমে ভ্রূণ মাতৃদেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নিজ দেহ থেকে বর্জ্য বহিষ্কার করে। মানুষসহ অন্যান্য সন্তান প্রসবকারী (viviparous) স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ মাতৃপ্রাণীর জরায়ুর অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। এদের ডিম্বাণু কুসুমবিহীন হওয়ায় গঠণোম্মুখ ভ্রূণ মাতৃপ্রাণী হতে অমরার মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বর্জ্য পদার্থ বর্জন করে। বিশিষ্ট ভ্রূণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে (Willium Harvey, 1659) সর্বপ্রথম অমরার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। মানুষের ভ্রূণ গঠনের 12 সপ্তাহ (3 মাস) পরে অমরা গঠিত হয়। মানুষের অমরা কোরিয়নিক (Chorionic) ধরনের অর্থাৎ ভ্রূণের বর্হিভ্রূণীয় পর্দা কোরিয়ন এবং মায়ের জরায়ু প্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর মিলে অমরা গঠিত হয়।

মানুষের অমরা লালচে নীল বা ক্রিমসন বর্ণের, চাকতি আকৃতির, ব্যাস 20-22 সেমি, মাঝখানে 2-2.5 সেমি পুরু এবং 500-600 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট। ভ্রূণের কোরিয়ন পর্দা থেকে অসংখ্য কোরিয়নিক ভিলাই (Chorionic villi) জরায়ুর প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভ্রূণ থেকে আগত 40-50 সেমি লম্বা নাভিরজ্জু বা অ্যাম্বিলাকাল কর্ড (umbilical cord) এর মধ্য দিয়ে প্রসারিত অ্যাম্বিলাকাল ধমনি ও অ্যাম্বিলাকাল শিরা কোরিয়নিক ভিলাইয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিক

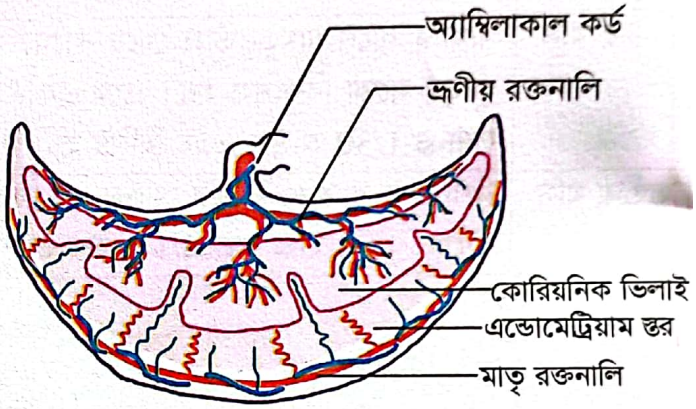

চিত্র ৯.১৪ মানুষের অমরা

অমরার কাজ (Function of placenta)

অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ ও মাতৃদেহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হলেও উভয়ের রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। বিনিময়যোগ্য বস্তুসমূহ ব্যাপন পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয়। অমরাতে বিদ্যমান পর্দাগুলোর সকলেই অর্ধ্যভেদ্য এবং কিছু নির্বাচিত বস্তুই এদের মধ্যদিয়ে যেতে পারে। খাদ্য ও অক্সিজেন মাতৃরক্ত হতে ভ্রূণে এবং রেচন ও শ্বসন বর্জ্য ভ্রূণ থেকে মাতৃরক্তে ব্যাপন পদ্ধতিতে প্রবেশ করে। অমরা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেঃ

১। **সংস্থাপন:** অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ জরায়ুতে সংস্থাপিত হয়।

২। **পুষ্টি:** অমরার মাধ্যমে মাতৃপ্রাণী হতে খাদ্যসার, পানি, খনিজলবণ, ভিটামিন ইত্যাদি ভ্রূণে পৌছায়।

৩। **শ্বসন:** অমরার মাধ্যমে মাতৃপ্রাণী ও ভ্রূণের শ্বসন গ্যাসের (CO_2 ও O_2) বিনিময় ঘটে।

৪। **বর্জ্য নিষ্কাশন:** অমরার মাধ্যমে রেচনঘটিত বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিনিন) ভ্রূণ হতে ব্যাপন পদ্ধতি মাতৃদেহের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

৫। **সঞ্চয়:** অমরা চর্বি, গ্লাইকোজেন, লৌহ ইত্যাদি সঞ্চয় করে। অমরা ভ্রূণের জন্য রক্তের আধার হিসেবে কাজ করে।

৬। **বিপাক:** অমরা প্রোটিন বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

৭। **অনাক্রম্যতা:** মাতৃদেহ হতে অমরার মাধ্যমে IgG অ্যান্টিবডি ভ্রূণদেহে পরিবাহিত হয়ে ভ্রূণকে বিভিন্ন রোগের (ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর ইত্যাদি) বিরুদ্ধে অনাক্রম্য করে তোলে।

৮। **হরমোন নিঃসরণ:** অমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে এবং এটি থেকে হিউমেন কোরিয়নিক গোনাডোট্রফিন, প্রোজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও হিউমেন প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন হরমোন নিঃসৃত হয়।

CamScanner

বর্হিভ্রূণীয় পর্দা (Extraembryonic membrane)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণের চারদিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী কতগুলো অস্থায়ী পর্দা বা ঝিল্লি আর্বিভূত হয়। এদের **বর্হিভ্রূণীয় পর্দা** বলা হয়। মানুষসহ স্থলে ডিম পাড়া ও অন্তঃনিষেক ঘটানো সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের পরিস্ফুটনরত ভ্রূণের চারদিকে নিম্নলিখিত চারটি পর্দা আর্বিভূত হয়:

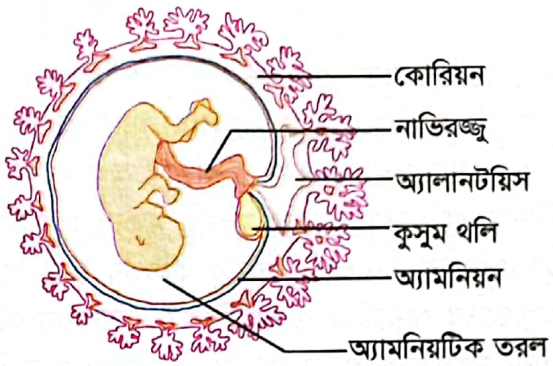

চিত্র ৯.১৫ মানুষের বর্হিভ্রূণীয় পর্দা

১। **অ্যামনিয়ন** (Amnion): এটি তরল পদার্থ পূর্ণ পর্দা যা ভ্রূণকে ঘিরে রাখে। এটি ভ্রূণকে বাহিরের চাপ, তাপ ও শুষ্কতা হতে রক্ষা করে।

২। **অ্যালানটয়িস** (Allantois): এটি ভ্রূণীয় অন্ত্রের সাথে যুক্ত রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ এটি পর্দা। এতে রেচন বর্জ্য জমা থাকে এবং এটি শ্বসনে সাহায্য করে।

৩। **কোরিয়ন** (Chorion): এটি ভ্রূণে সর্ববহিঃস্থ পর্দা যা ভ্রূণের শ্বসন ও পুষ্টি গ্রহণে সহায়তা করে। এটি অমরা গঠন করে।

৪। **কুসুম থলি** (Yolk sac): এটি ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সাথে যুক্ত একটি থলি বিশেষ। এটি **স্টেম কোষের** (stem cell) উৎস হিসেবে কাজ করে যেগুলো রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড কোষ সৃষ্টি করে।

ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of germ layers)

কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীতে ভ্রূণীয়স্তরের পরিণতি মূলত একই ধরনের হলেও বিভিন্ন শ্রেণিতে এর কিছু তারতম্য ঘটে। নিম্নে মানুষের তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতির তালিকা দেয়া হলো-

ভ্রূণীয় স্তর	পরিণত মানুষে গঠিত কলা
এক্টোডার্ম	• ত্বক ও ত্বকোদ্ভূত অঙ্গাদির (ঘর্ম গ্রন্থি, তেল গ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, চুল, নখ) এপিডার্মিস। • ঠোঁট, মুখবিবর, জিহ্বা ও পায়ুছিদ্রের অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ। • চোখের রেটিনা, কর্নিয়া ও লেন্স এবং অন্তঃকর্ণের মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। • পিটুইটারি গ্রন্থি ও পিনিয়াল গ্রন্থির এপিথেলিয়াম আবরণ, বৃক্কের মেডুলা। • স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গসমূহ, দাঁতের এনামেল।
মেসোডার্ম	• ত্বকের ডার্মিস। • নটোকর্ড, মেরুদণ্ড, কঙ্কালতন্ত্র, পেশি কলা ও যোজক কলা। • বৃক্কের কর্টেক্স, পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশিকলা। • দাঁতের ডেন্টিন ও চোখের বিভিন্ন অংশ। • রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা। • দেহগহ্বরের অন্তঃপ্রাচীর।
এন্ডোডার্ম	• পরিপাকনালি অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ। • শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, রেচননালি, মুত্রনালি ও মুত্রথলির এপিথেলিয়াল আবরণ। • মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। • গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়।

CamScanner

৯.৩ গর্ভবস্থা ও পরিচর্যা (Pregnancy and Care)

বাংলাদেশে বর্তমানে গর্ভকালীন ও প্রসবজনিত জটিলতার কারণে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি হাজারে 32 জন। একারণে এদেশে প্রতিবছর প্রায় 12,000 মা মারা যায়। প্রতি ঘণ্টায় গর্ভকালীন ও প্রসবজনিত জটিলতায় 3 জন মা মৃত্যুবরণ করে। সারাদেশের শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবে এ অকাল মৃত্যু ঘটে চলছে। কোনো একটি দেশের মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যার বিস্তার বা গুরুত্ব বুঝতে মায়ের মৃত্যুহার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক (parameter) হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র মহিলার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি বিষয়ে এখনও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় না, ফলে গর্ভবতী মায়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ দারুনভাবে ব্যহত হয়। এছাড়া সামাজিক রীতিনীতি, বিভিন্ন কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং সংসারের অভাব অনটনের কারণে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা হয়ে উঠে দারুনভাবে অবহেলিত।

গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে গর্ভবতী (pregnant) বলে। সাধারণত একটি সন্তান 34-38 সপ্তাহ মায়ের গর্ভে অবস্থান করে। এসময় মায়ের দেহ হতে পুষ্টিলাভ করে সন্তান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গর্ভধারণের সময় মহিলাদের দেহে বহিঃভ্রূণীয় তরল সৃষ্টি হয় তাতে গর্ভবতীর দৈহিক ওজন 25% বৃদ্ধি পায়। শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে গর্ভবতী মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টি ও সেবা। সুস্থ ও সবল সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক দায়িত্ব রয়েছে। গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যায় পালনীয় বিষয়গুলো হলো-

১। **পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ:** গর্ভবতী মাকে সুষম পুষ্টি সম্পন্ন খাবার খেতে হবে। লৌহ ঘাটতি পূরণের জন্য বেশি পরিমাণে শাকসব্জি, ফলমূল খেতে হবে। গর্ভবতী মায়ের প্রতিদিন কমপক্ষে 8-9 গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত।

২। **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:** গর্ভবতী মাকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত নখ ও দাঁতের যত্ন নিতে হবে। প্রতিদিন গোছল করে ঢিলেঢালা পরিচ্ছন্ন জামা পড়তে হবে।

৩। **বিশ্রাম ও নিদ্রা:** গর্ভাবস্থায় পরিমিত বিশ্রাম দরকার। প্রতিদিন দুপুরে 2 ঘণ্টা ও রাতে 8 ঘণ্টা ঘুমানো গর্ভবতী মায়ের জন্য আবশ্যক।

৪। **কাজ কর্ম:** গর্ভবতী মা স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে পারবে তবে পরিশ্রমী কাজ ও ভারী বস্তু উত্তোলন হতে বিরত থাকতে হবে।

৫। **ভ্রমণ:** গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস এবং শেষ দুই মাস ঝাঁকুনিযুক্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণ না করা উচিত।

৬। **ধূমপান ও মদ্যপান:** গর্ভবতী মায়ের ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা উচিত। তা না হলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিতে পারে।

৭। **যৌন সহবাস:** গর্ভসঞ্চারণের প্রথম তিন মাস এবং শেষের দেড় মাস যৌন মিলন হতে বিরত থাকা উচিত। এতে গর্ভপাত, অকাল প্রসব ও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভবতী মায়ের সুরক্ষার চিহ্ন

৮। **টিকা:** প্রত্যেক মাকে গর্ভাবস্থার ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসে একটি করে টিটেনাস টিকা নিতে হবে।

৯। **ডাক্তারের পরামর্শ:** গর্ভবতী মাকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এসময় কমপক্ষে তিনবার হাসপাতালে যাওয়া উচিত। প্রয়োজনে বিভিন্ন শারীরিক প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হবে। প্রসবকালে জটিলতা দেখা দিলে ঝুঁকি না নিয়ে গর্ভবতীকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। **সচেতনা বৃদ্ধি:** গর্ভবতী মায়ের নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য তিনটি বিলম্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে যথা. *সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব, সেবা কেন্দ্রে যেতে বিলম্ব* এবং *সঠিক চিকিৎসা নিতে বিলম্ব*। এসব বিলম্বের কারণে অধিকাংশ গর্ভবতী মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে।

৯.৪ পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধ পদ্ধতি
(Family planning and Contraceptive methods)

সুস্থ পারিবারিক জীবন মানে এমন একটি জীবন যেখানে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো খুব সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পূরণ করা যায়। টানাপড়েনের সংঘাতে জীবন এখন খুড়িয়ে চলে না। তাই সুস্থ পারিবারিক জীবন গঠনে

CamScanner

এমন একটি জীবনের কথা চিন্তা করতে হবে যেখানে জীবন অর্থাভাবে, স্থানাভাবে ও চিকিৎসার অভাবে ভারাক্রান্ত নয়। আর এরকম সুস্থ বা স্বাস্থ্যকর জীবন গঠনের মূল কথা হলো পরিকল্পিত পরিবার।

পরিবার পরিকল্পনা (Family planning)

পরিবার পরিকল্পনা জীবনধারনের এমন একটি পদ্ধতি যা একটি ব্যক্তি বা দম্পতি নিজেরা সবকিছু জেনে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে যাতে পরিবারের লোকসংখ্যা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা যায় এবং যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক হবে। পরিবার পরিকল্পনায় কতগুলো অভ্যাসের সমন্বয় ঘটায় যা কোনো দম্পতিকে কতগুলো উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে।

পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of family planning)

(১) অনাকাঙ্খিত জন্মকে এড়িয়ে চলা; (২) ইচ্ছেমতো সন্তান নেয়া; (৩) দুটি সন্তানের মধ্যে সময় নিয়ন্ত্রণ করা; (৪) কোনো দম্পতি কোন বয়সে বাচ্চা নিবে তা নির্ধারণ করা; (৫) সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণ করা; (৬) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা; (৭) অকাল গর্ভপাত রোধ করা; (৮) দারিদ্রতা দূর করা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করে দেশের উন্নয়ন করা।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় (Measures to population control of Bangladesh)

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃহৎ এবং দ্রুত বর্ধনশীল। এদেশে 1% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে বছরে প্রায় 16 লক্ষ নতুন মানুষ যুক্ত হওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বছরে এদেশে প্রতিবছর প্রায় 40 লক্ষ মানুষ যোগ হচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। উচ্চ জন্মহার বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। উচ্চ জন্মহার রোধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। **বাল্যবিবাহ বন্ধ করা:** বাংলাদেশের আইনে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স যথাক্রমে 21 ও 18 বছর। বিয়ে সম্পর্কিত এ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ কতে হবে।

২। **মহিলাদের মর্যাদা উন্নত করা:** বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা বৈষম্যের শিকার। তারা এখনো চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কেবল বাচ্চা লালন-পালন কাজে ব্যস্ত থাকে। লেখাপড়া, চাকুরী ও ব্যবসাক্ষেত্রে অধিক সুযোগ দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। **শিক্ষার বিস্তার ঘটানো:** শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিকোণ বদলায়। শিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্যে দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা দেখা যায় এবং তারা পরিবার ছোট রাখতে চেষ্টা করে। শিক্ষিত মহিলা স্বাস্থ্য সচেতন হয় এবং অনেক বাচ্চা নিতে নিরুৎসাহিত হয়।

৪। **সামাজিক নিরাপত্তা:** বেশি বেশি মানুষকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ কিংবা চাকুরীবিহীন অবস্থায় পরনির্ভরশীল হতে হবে না বিধায় অধিক সন্তান জন্মদানের অভিলাস হ্রাস পাবে।

৫। **উন্নত জীবনযাপনে উদ্ভূত করা:** বৃহৎ পরিবার উন্নত জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে। উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষ পরিবার ছোট রাখতে চেষ্টা করবে।

৬। **নগরায়ন:** গবেষণায় দেখা গেছে শহরের মানুষের জন্মহার গ্রামের মানুষ অপেক্ষা কম। সেজন্য দ্রুত নগরায়ন ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে।

৭। **পরিবার পরিকল্পনা:** পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে মানুষের জন্মহার রোধ করা যায়। সুতরাং প্রতিটি পরিবারকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮। **চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা:** সিনেমা, নাটক, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ব্যবস্থা মানুষের জন্মহার কমায়। সুতরাং জনগণের জন্য চিত্তাবিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৯। **গণসচেতনতা সৃষ্টি:** ছোট পরিবারের সুবিধা এবং বড় পরিবারের অসুবিধা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, ফেইসবুক, সংবাদপত্রসহ সকল ধরনের গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

CamScanner

১০। **প্রণোদনা:** জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পরিবার পরিকল্পনার গ্রহণকারী পরিবারকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

গর্ভনিরোধ পদ্ধতি (Contraceptive methods)

গর্ভধারণ রোধ করার জন্য যেসব পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে গর্ভনিরোধ পদ্ধতি বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। প্রাচীন মিশরীয়রা খিস্ট্রপূর্ব 2000 অব্দে জন্মনিরোধক হিসেবে কুমিরের বিষ্ঠা ব্যবহার করতো। বর্তমানে গর্ভনিরোধের কার্যকরি প্রধান পদ্ধতি হলো:

স্বল্পমেয়াদী অস্থায়ী পদ্ধতি (Short term temporary methods)

১। **জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি (Birth control pill):** জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি হলো হরমোন (ইস্ট্রোজেন + প্রোজেস্টেরন) মিশ্রিত মুখে খাবার উপযোগী এক ধরনের ওষুধ যা গর্ভধারণ রোধে প্রতিদিন গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন ব্রান্ডের জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি আছে যেগুলো সহজলভ্য, নিরাপদ ও ফলপ্রসু।

২। **মহিলাদের কনডম (Condom-female):** মহিলাদের কনডম বিশেষ ধরনের রবারের লম্বাকৃতির থলি যার উভয় প্রান্তে একটি নমনীয় রিং থাকে। সঙ্গমের সময় এটি যোনিতে ব্যবহার করা হয় যা গর্ভধারণ রোধ ছাড়াও যৌন বাহিত রোগের সংক্রমণ রোধ করে।

২। **পুরুষের কনডম (Condom-male):** পুরুষের কনডম বিশেষ ধরনের রবারের লম্বাকৃতির থলি যার এক প্রান্তে একটি নমনীয় রিং থাকে এবং অন্য প্রান্ত বদ্ধ থাকে। সঙ্গমের সময় এটি লিঙ্গে পরিধান করা হয় যা গর্ভধারণ রোধ ছাড়াও যৌন বাহিত রোগের সংক্রমণ রোধ করে।

চিত্র ৯.১৬ গর্ভনিরোধের কার্যকরি পদ্ধতি

৩। **ইনজেকশন (Injection):** জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইনজেকশনকে ডেপ্রো-প্রোভেরা (Depo-Provera) বলা হয়। এটি প্রেজেস্টিন হরমোনযুক্ত তরল যা বেশ কয়েক মাস মহিলাদের ডিম্বাণু উৎপাদন রহিত রাখে।

৪। **ডায়াফ্রাম (Diaphragm):** এটি নরম সিলিকন নির্মিত একটি অগভীর কাপ আকৃতির গঠন যা জরায়ুর সার্ভিক্সে স্থাপন করা হয় যাতে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে নিষেক ঘটাতে না পারে।

CamScanner

৫। স্পঞ্জ (Sponge): এটি নরম প্লাস্টিক নির্মিত ক্ষুদ্র স্পঞ্জের মতো গঠন বিশেষ যা সঙ্গমের পূর্বে যোনিতে স্থাপন করা হয়। এতে শুক্রাণুনাশক পদার্থ মিশ্রিত থাকে যা জরায়ুতে প্রবেশকৃত শুক্রাণুসমূহ মেরে ফেলে।

৬। স্পার্মিসাইড (Spermicide): এটি পেস্টের মতো অর্ধ তরল রাসায়নিক পদার্থ যা সঙ্গমের পূর্বে যোনিতে প্রয়োগ করা হয়। এর প্রভাবে শুক্রাণুসমূহ ডিম্বাণুর সাথে মিলনের পূর্বেই মারা যায়।

দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী পদ্ধতি (Long term temporary methods)

১। অন্তঃজরায়ুজ যন্ত্র (Intrauterine Device -IUD): এটি T আকৃতির ধাতব পদার্থ নির্মিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র যা জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। এটি অত্যন্ত কার্যকরি দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

২। ইমপ্লান্ট (Implant): এটি প্রোজেস্টেরন হরমোন সমৃদ্ধ একটি ক্ষুদ্র, দিয়াশলাই কাঠির মতো সরু দণ্ড বিশেষ। এটি মহিলাদের বাহুতে স্থাপন করা হলে এটি হরমোন ক্ষরণ করে যা গর্ভধারণ রোধ করে।

৩। রিং (Ring): জন্ম নিয়ন্ত্রণ রিং বা নোভা রিং একটি নিরাপদ ও সহজলভ্য যন্ত্র যা যোনিতে স্থাপন করা হয়। ক্ষুদ্র ও নমনীয় রিং দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে যা গর্ভধারণ রোধ করে।

স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent methods)

গর্ভনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতিকে বন্ধ্যাকরণ (sterilisation) বলে। বন্ধ্যাকরণ মানুষের যৌন আখাঙ্খা বা ক্রিয়ার কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। পুরুষ ও মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ ভিন্নভাবে হয়। যেমন-

১। ভ্যাসেকটমি (Vasectomy): পুরুষের বন্ধ্যাকরণকে ভ্যাসেকটমি বলে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষের উভয় শুক্রাশয়ের শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু বের হতে না পারে।

২। টিউবেকটমি (Tubectomy) বা টিউবাল লাইগেশন (tubal ligation): মহিলাদের বন্ধ্যাকরণকে টিউবেকটমি বা টিউবাল লাইগেশন বলে। এক্ষেত্রে অপারেশনের মাধ্যমে মহিলারে উভয় ডিম্বাশয়ের ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণুর প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। এতে নিষেক সম্পন্ন হয় না।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি (Natural methods)

১। লিঙ্গ প্রত্যাহার (Penis Withdrawal): সঙ্গমের চূড়ান্ত পর্যায়ে বীর্য স্খলনের পূর্ব মুহূর্তে লিঙ্গকে যোনি থেকে প্রত্যাহার করে দেহের বাইরে বীর্য স্খলন ঘটানোর মাধ্যমে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করা যায়। তবে এটি পুরোপুরি নিরাপদ ব্যবস্থা নয়।

২। স্তনপান করানো (Breastfeeding): শিশুকে স্তনপান করানো কেবল শিশুর জন্যই মঙ্গলকর নয়, এটি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একটি জন্ম বিরতির কারণ। কেননা এসময় মায়ের রজঃস্রাব বন্ধ থাকায় গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৩। নিরাপদ সঙ্গম সময় (Safe intercourse period): রজঃচক্রের প্রথম ও শেষ সপ্তাহের দিনগুলোতে ডিম্বানালিতে কোনো পরিপক্ক ডিম্বাণু থাকে না বলে এসময়ে যৌন মিলন করলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা কম থাকে। এসময়কে নিরাপদ সঙ্গম সময় বলা হয়।

৯.৫ আইভিএফ পদ্ধতি-কৃত্রিম গর্ভধারণ

ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (*In vitro* fertilization) বা আইভিএফ (IVF) বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি যেখানে মানব ডিম্বাণু-শুক্রাণুর নিষেক ক্রিয়া দেহের বাইরে সম্পন্ন হয়। যখন মানুষের সকল সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হয় তখন আইভিএফ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এটি টেস্ট টিউব বেবি (test-

CamScanner

tube baby) পদ্ধতি বা অ্যাসিস্টেট রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি (assisted reproductive technology-ART) নামে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে সৃষ্ট মানব ভ্রূণ টেস্ট টিউবে বেড়ে উঠে না বরং অন্য দশটি বাচ্চার মতো মায়ের জরায়ুতেই বেড়ে উঠে। এ পদ্ধতিতে মহিলার ডিম্বাণু গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু অপসারণ করে গবেষণাগারে কাঁচের নলে বিদ্যমান তরল মাধ্যমে স্থাপন করা হয় এবং পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষেক ঘটানো হয়। এজন্য এ পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (*In vitro* = কাঁচের ভেতরে)। এরপর নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটকে মায়ের জরায়ুতে স্থাপন করে সার্থকভাবে গর্ভধারণ করানো হয়।

বিশ্বে আইভিএফ পদ্ধতিতে প্রথম শিশুর জন্ম হয় ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে 1978 সালের 25 জুলাই। রাত 11.47 টায় ওল্ডহ্যাম এন্ড ডিস্ট্রিক জেনারেল হাসপাতালে ড. রবার্ট জি এডওয়ার্ডস (Dr. Robert G. Edwards) এর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয়া 2.61 কেজি ওজনের লুইস ব্রাউন (Louise Brown) নামের কন্যা শিশুটি বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবি। লেসলি ও পেটার ব্রাউন (Lesley and Peter Brown) তার বাবা-মা। আইভিএফ প্রযুক্তির জনক ড. এডওয়ার্ডসকে 2010 সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। তিনি বর্তমানে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক।

কেন আইভিএফ পদ্ধতি পছন্দ করা হয়?

নারীর গর্ভধারণ কাজে আইভিএফ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রজননের বিভিন্ন অক্ষমতার চিকিৎসায় এটি একটি পছন্দনীয় পদ্ধতি। যেসব কারণে আইভিএফ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলো:

১। জরায়ুর মুখ থেকে ডিম্বনালি পর্যন্ত প্রয়োজনীয় শুক্রাণু যেতে অসমর্থ হলে।
২। নারীর টিউবাল ডিফেক্ট বা ডিম্বনালির সমস্যার কারণে।
৩। স্বামীর কার্যকর শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকলে।
৪। নিঃসন্তান দম্পতির স্ত্রীর বয়স বেশি হয়ে গেলে।
৫। এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের কারণে। (জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরের কোষ প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত থাকলে তাকে এন্ডোমেট্রিওসিস ডিজিস বলে)
৬। অব্যাখ্যায়িত প্রজনন অক্ষমতার কারণে।

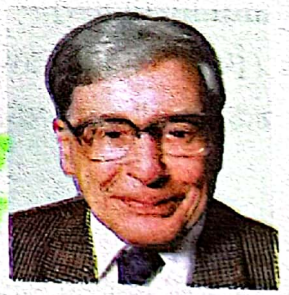

জি এডওয়ার্ডস

লুইস ব্রাউন

আইভিএফ কৌশল

পাঁচটি মৌলিক ধাপের মাধ্যমে আইভিএফ পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়। ধাপগুলো হলোঃ

ধাপ-১. উদ্দীপনা সৃষ্টি (Stimulation): প্রক্রিয়ার শুরুতে স্ত্রীকে ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য উদ্দীপক হিসেবে ফার্টিলিটি ওষুধ (fertility drugs) প্রয়োগ করা হয়।

ধাপ-২. ডিম্বাণু সংগ্রহ (Egg retrieval): স্ত্রীর পরিণত ডিম্বাণু ফলিকুলার অ্যাসপিরেশন (follicular aspiration) নামক ছোট সার্জারির মাধ্যমে ডিম্বাশয় থেকে বের করে আনা হয়। ডিম্বাণু সংগ্রহে অনেকসময় পেলভিক ল্যাপারোস্কোপির (pelvic laparoscopy) প্রয়োজন হয়। কোনো মহিলা ডিম্বাণু উৎপাদনে অক্ষম হলে অন্য কারো দানকৃত ডিম্বাণু ব্যবহার করা হয়।

ধাপ-৩. ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিশ্রণ ও নিষেক (Insemination and Fertilization): স্ত্রীর ডিম্বাণু সংগ্রহের সময়ে স্বামীর বীর্য সংগ্রহ করে তা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সজীব ও অতি সক্রিয় কতগুলো শুক্রাণু বেছে নেয়া হয়।

CamScanner

নিষেক সম্পন্ন করার জন্য শুক্রাণুগুলোকে একটি টেস্ট টিউবে (পেট্রিডিশ) ডিম্বাণুর সাথে মেশানো হয়। টেস্ট টিউবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণকে ইনসেমিনেশন (insemination) বলা হয়। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুবাহী টেস্ট টিউবকে মাতৃগর্ভের অনুরূপ পরিবেশের একটি ইনকিউবেটরে সংরক্ষণ করা হয়। ইনসেমিনেশনের 24 থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর নিষিক্তকরণ সম্পন্ন হয়।

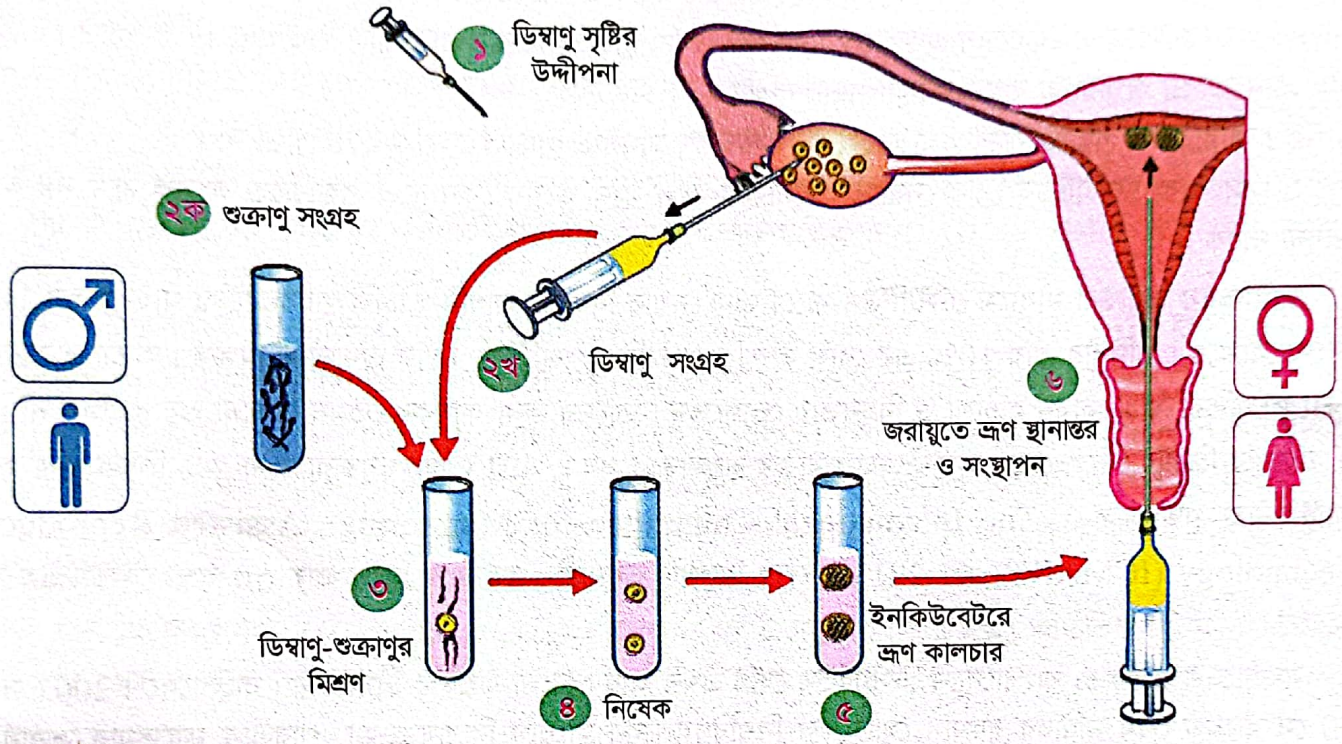

চিত্র ৯.১৭ আইভিএফ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ

ধাপ-৪. ভ্রূণ কালচার (Embryo culture): নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট বিভাজিত হয়ে ক্রমে উহা বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয়। গবেষণাগারে ইনকিউবেটরের ভেতর ভ্রূণের বৃদ্ধি 3-5 দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ধাপ-৫. ভ্রূণ স্থানান্তর ও সংস্থাপন (Embryo transfer and implantation): ডিম্বাণু সংগ্রহ ও নিষিক্তকরণের 3-5 দিনের মধ্যেই বিভাজনশীল ভ্রূণকে স্ত্রীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। একটি সরু নল বা ক্যাথেটারের (catheter) মাধ্যমে যোনি ও জরায়ুর সারভিক্সের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিভাজনশীল ভ্রূণ জরায়ুতে সংস্থাপিত হলেই গর্ভসঞ্চার সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। তবে অবশ্যই এটি আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হয়।

জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পরে ঘটনা স্বাভাবিক গর্ভধারণের মতোই। মাতৃগর্ভে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষেকের ফলে যেভাবে ভ্রূণ বেড়ে উঠে, তেমন করেই বেড়ে উঠে টেস্টটিউব বেবিও। বাচ্চার প্রসব স্বাভাবিকভাবে হতে পারে অথবা সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। জন্ম নেয়া শিশুরা অন্যান্য শিশুর মতোই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে।

একই সময়ে একাধিক ভ্রূণ জরায়ুতে সংস্থাপিত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জমজ বা তিনটি বা অধিক শিশুর জন্মলাভ ঘটতে পারে। নিষিক্তকরণের পর অব্যবহৃত ভ্রূণগুলোকে হিমাগারে সংরক্ষণ করা বা দান করা যেতে পারে। আইভিএফ পদ্ধতির সার্বিক ঘটনাকে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

ডিম্বাণু সৃষ্টির উদ্দীপনা ⇨ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ ⇨ টেস্টটিউবে ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিশ্রণ ও নিষেক ⇨ ইনকিউবেটরে ভ্রূণ কালচার ⇨ জরায়ুতে ভ্রূণ স্থানান্তর ও সংস্থাপন

CamScanner

আইভিএফ পদ্ধতির অসুবিধা

১। আইভিএফ পদ্ধতির সফলতার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

২। টেস্টটিউব শিশুদের বিকলাঙ্গতা ও বিরল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে বলে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন।

৩। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় ডিম্বাশয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রক্তক্ষরণ ও পরবর্তীতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে।

৪। অনেকক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় একসাথে একাধিক অর্থাৎ দুটি বা তিনটি বা চারটি শিশু জন্ম নিতে পারে। এর ফলে কম ওজন সম্পন্ন অপরিণত বাচ্চা জন্মের সম্ভাবনা থাকে।

৫। আইভিএফ পদ্ধতি অনেক ব্যয়বহুল বলে সাধারণ মানুষ এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না।

৬। অনেকে টেস্টটিউব বেবি নেয়াকে অনৈতিক বলে মনে করেন কেননা এ পদ্ধতিতে অনেক ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

আইভিএফ প্রযুক্তির মাধ্যমে টেস্টটিউব বাচ্চা জন্ম দেয়ার বিষয়টি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় 10% এর বেশি দম্পতি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। অতীতে সন্তানহীন বন্ধ্যা দম্পতিরা সারা জীবন হতাশা ও বিষন্নতায় ভোগতেন। তাদের জন্য কার্যকর তেমন কোনো ওষুধও ছিল না। কিন্তু এ হতাশার চিত্রটি বদলে গেছে আইভিএফ প্রযুক্তির সফলতার পর। 2013 সালে যুক্তরাজ্যের 2% শিশুর জন্ম হয়েছে আইভিএফ পদ্ধতিতে। The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) এর 2013 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে প্রায় 50 লক্ষ টেস্টটিউব বাচ্চা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: বাংলাদেশে টেস্টটিউব বেবি এখন আর কোনো কল্পনার বিষয় নয়। বাংলাদেশে 2001 সালের 30 মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পারভীন ফাতেমার তত্ত্বাবধানে ফিরোজা বেগম নামের এক প্রসূতি জন্ম দেন এদেশের প্রথম টেস্ট টিউব বেবির। এক সাথে জন্ম নেয় তিন কন্যাশিশু। তাদের নাম রাখা হয় হীরা, মনি ও মুক্তা। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ডা. পারভীন ফাতেমার নেতৃত্বে ঢাকার শ্যামলীতে স্থাপিত হয় 'Centre for Assisted Reproduction (CARe)' নামের একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সিঙ্গাপুরের মাউথ এলিজাবেথ হাসপাতালের সহযোগিতায় ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে 2006 সালে স্থাপিত 'Fertility Centre' সফলভাবে একাজ সম্পন্ন করছে।

৯.৬ প্রজননতন্ত্রের সমস্যা

পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা বা বন্ধ্যাত্ব (Infertility in men and women)

সন্তান লাভের চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছের এমন দম্পতির সংখ্যা অনেক। চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, 10% দম্পতির সন্তান লাভের জন্য চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হয়। নারী কিংবা পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়ার অক্ষমতাকে প্রজনন অক্ষমতা বা বন্ধ্যাত্ব বলে। এটি দম্পতির উভয়ের কারণে কিংবা কোনো একজনের কারণে হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই সন্তান না হলে তার দায়িত্ব এককভাবে স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের প্রবণতা মোটেও বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয় বরং এটি বিজ্ঞান বিরোধী। অশিক্ষা ও কুসংস্কার হতে এধরনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বের 10% থেকে 15% দম্পতি সন্তান জন্মদানে অর্থাৎ নিয়মিত ও কোনোরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া যৌন মিলনের পরও সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ। এসব দম্পতির মধ্যে 40% দায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়ই, 20% দায়ী কেবল স্বামী, 30% দায়ী কেবল স্ত্রী এবং 10% এর কারণ অজানা। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই।

CamScanner

নারীর প্রজনন অক্ষমতার কারণ (Reasons for female infertility)

নারীর প্রজনন অক্ষমতার বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১। ওভ্যুলেশন সমস্যা (Ovulation problems): মেয়েদের মাসিক রজঃচক্রের সময় ডিম্বাণু উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ওভ্যুলেশন (ovulation) বলে। ওভ্যুলেশন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট হরমোনের সমস্যাজনিত কারণে নারী প্রজননে অক্ষম হতে পারে। এর প্রধান কারণগুলো হলো-

(ক) পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রম (Polycystic Ovarian Syndrome-PCOS): PCOS রোগাক্রান্ত মহিলাদের দেহে নিয়মিত ডিম্বাণু উৎপাদন হয় না ফলে তাদের মাসিক রজঃচক্র অনিয়মিত বা বন্ধ হয়ে যায়।

(খ) অপরিণত মেনোপোজ (Early Menopause): যখন মহিলাদের মাসিক রজঃচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আর গর্ভবতী হতে পারে না তখন তাকে মেনোপোজ বলে। সাধারণত মহিলাদের 49 থেকে 52 বছর বয়সে মেনোপোজ ঘটে। কিন্তু অনেক মহিলার ডিম্বাশয়ে ফলিকল উৎপাদন হ্রাসের কারণে 40 বছর বয়সেই মেনোপোজ ঘটে এবং প্রজননে অক্ষম হয়।

(গ) হরমোনের ভারসাম্যহীনতা (Hormonal imbalances): অনেকসময় FSH, LH, ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণে স্ত্রীদের ডিম্বাশয় থেকে সঠিকভাবে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় না।

২। ফেলোপিয়ান নালির সমস্যা (Problem in fallopian tubes) : স্ত্রী জননতন্ত্রের ফেলোপিয়ান নালির মাধ্যমে শুক্রাণু পরিবাহিত হয়ে ডিম্বাণুর সান্নিধ্যে আসে। সংক্রমণ রোগ, এন্ডোমেট্রিওসিস, পেলভিক সার্জারি কিংবা অন্য কোনো কারণে এ নালি নষ্ট হয়ে গেলে নারীরা প্রজননে অক্ষম হয়। এছাড়া দৈহিক যে কোনো কারণে এ নালির পথ বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা বাঁকা হয়ে গেলে ডিম্বাণু সঠিকভাবে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মা হওয়া যায় না।

৩। জরায়ুমুখের সমস্যা (Cervical causes): অনেক নারীর জরায়ুমুখে (সারভিক্স) অতিরিক্ত মিউকাস সৃষ্টি হয়ে অথবা অস্ত্রোপচারের ফলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে ডিম্বাণু জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হয়।

৪। উচ্চ মাত্রার LH/প্রোল্যাকটিন (Hyperprolactinemia): রক্তে উচ্চ মাত্রার লুটিওট্রফিক হরমোন (LH) বা প্রোল্যাকটিন বিভিন্ন গোনাডোট্রফিক হরমোনের ক্ষরণ হ্রাস করে ডিম্বাণুজননে বাধার সৃষ্টি করে। কিছু ওষুধ, যেমন- জন্ম নিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি গ্রহণের কারণে রক্তে প্রোল্যাকটিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

৫। জন্মগত ত্রুটি (Congenital abnormalities): প্রজননতন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি বিশেষ করে জরায়ু ও যোনির গঠনের জন্মগত ত্রুটির কারণে মহিলাদের প্রজনন অক্ষমতা দেখা যায়।

৬। জরায়ুর রোগ (Uterine diseases): জরায়ুতে পলিপ কিংবা ফাইব্রয়েড সিস্ট থাকলে কিংবা জরায়ুতে টিউমার হলে, এটি ভ্রূণ ধারণ করতে পারে না।

৭। অজানা কারণ (Unknown causes): অনেক নারীর প্রজনন অক্ষমার কারণ আজও জানা যায়নি। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম প্রায় 10% মহিলা এ ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত।

৮। অন্যান্য সমস্যা (Others problems): ডায়াবেটিস, ধুমপান, স্টেরয়েড ওষুধ, অতিরিক্ত মদ্যপান, দেহের অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি কারণে নারীর প্রজনন ক্ষমতা থাকে না।

পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার কারণ (Reasons for male infertility)

পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১। শুক্রাণু উৎপাদনে সমস্যা (Sperm production problems): পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো শুক্রাণু উৎপাদনের সমস্যা। এদের শুক্রাশয় কর্তৃক অতি অল্প সংখ্যক শুক্রাণু উৎপাদন কিংবা উৎপাদিত শুক্রাণুর কার্যহীনতা এ সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রজননে অক্ষম দুই-তৃতীয়াংশ পুরুষ এ সমস্যায় আক্রান্ত।

২। যৌন বাহিত রোগ (Sexually transmitted diseases): কিছু যৌন বাহিত রোগ, যেমন- গনোরিয়া, সিফিলিস, ইত্যাদি দ্বারা প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হলে শুক্রাণু উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, শুক্রাণুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং শুক্রাণুর গমণ পথ বাধাগ্রস্থ হয়। তবে এসব সংক্রমণ চিকিৎসা দ্বারা সারানো যায়।

CamScanner

৩। জন্মগত ত্রুটি (Congenital abnormalities): শুক্রনালির জন্মগত ত্রুটির কারণে নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা বন্ধ হয়ে গেলে এটি শুক্রাণু পরিবহনে অক্ষম হয়, ফলে মানুষ সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হয়।

৪। বীর্যত্যাগে অক্ষমতা (Retrograde ejaculation): ডায়াবেটিস, স্কেরোসিস, স্পাইনাল ইনজুরি, প্রোস্টেট গ্রন্থির সার্জারি প্রভৃতি কারণে শুক্রাণু উৎপাদনে সক্ষম পুরুষ অনেকসময় সঙ্গমের সময় বীর্যত্যাগ করতে পারে না, ফলে প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয়।

৫। জিনগত রোগ (Genetic diseases): অনেকক্ষেত্রে জিনগত রোগ সিস্টিক ফাইব্রোসিস অথবা ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিকতা পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার কারণ হয়ে থাকে।

৬। অটোইমিউন সমস্যা (Autoimmune problems): কিছু পুরুষের রক্তে শুক্রাণু প্রতিরোধী অ্যান্টিজেন থাকে যারা নিজের শুক্রাণুকে বহিরাগত পদার্থ (foreign particles) বা ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করে এদের ধ্বংস করে। অনাক্রম্যতন্ত্রের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার ফলে 5-10% পুরুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

৭। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা (Hormonal imbalances): টেস্টোস্টেরন ও অন্যান্য যৌন হরমোনের অস্বাভাবিক ক্ষরণ পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার কারণ হয়।

৮। যৌনতা সমস্যা (Sexual problems): নপুংশক (impotence) বা লিঙ্গ উত্থানের ব্যর্থতা (erectile dysfunction) এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে লিঙ্গ প্রবেশের পূর্বেই বীর্যপাত (premature ejaculation) ঘটানোর কারণে পুরুষের জনন অক্ষমতা হতে পারে। কিছু মানসিক সমস্যা (বিষন্নতা, হতাশা, আত্মবিশ্বাসহীনতা) এবং শারিরিক সমস্যার (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎরোগ) কারণে পুরুষের যৌন সমস্যাগুলো দেখা দেয়।

৯। ভেরিকোসেলিস (Varicoceles): পুরুষের অণ্ডথলির প্রাচীরে বিদ্যমান প্যামপিনিফর্ম প্লেক্সাস শিরা (pampiniform plexus veins) ফুলে গিয়ে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে। এর ফলে শুক্রাশয়ের শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস পায় এবং শুক্রাণুর গুণগত মান নষ্ট হয় যা পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার জন্য দায়ী। প্রায় 20% কিশোর ও 15% পরিণত পুরুষ এরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১০। অন্যান্য কারণ (Other factors): পারমাণবিক বিকিরণ, এক্সরে, অতিমাত্রার তাপ, আঘাত, দীর্ঘ সময় সাইকেল চালোনো, ধূমপান, অ্যালকোহল সেবন, মাদক সেবন, মানসিক দুশ্চিন্তা, হতাশা, দেহের অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি কারণে অনেকসময় পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা হারায়।

প্রজনন অক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে পরীক্ষা

১। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করানো; ২। স্বামীর বীর্য পরীক্ষা করানো; ৩। স্ত্রীর ডিম্বাণু তৈরি ও নিঃসরণ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করানো; ৪। জরায়ু ও ডিম্বনালি পরীক্ষা করানো; ৫। জরায়ুর ভেতরের স্তরের ঝিল্লি পরীক্ষা করানো; ৬। স্বামী ও স্ত্রীর হরমোন পরীক্ষা করানো।

প্রজনন অক্ষমতায় চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী উভয়ের বন্ধ্যাত্ব দূর করা যায়। যেমন-

১। আধুনিক পদ্ধতি (Modern techniques): এন্ডোস্কোপিক সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, হিস্টেরোস্কোপি, মিরেনা, থার্মাল বেলুন এবং হিস্টেরেক্টমির মতো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে প্রজনন অক্ষমতা বা বন্ধ্যাত্ব দূর করা যায়।

২। আইভিএফ (In vitro fertilization-IVF): জরায়ু সুস্থ থাকলে অন্য যে কোনো ধরনের প্রজনন অক্ষমতায় আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবি পদ্ধতিতে সন্তান নেয়া যায়। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা 20 বছরের বেশি সময় ধরে সফলতার সাথে প্রচলিত আছে।

CamScanner

৩। ওষুধ সেবন (Drugs use): অনিয়মিত রজঃচক্রের সমস্যাপিরীত মহিলাদের হরমোনযুক্ত কিছু খাবারযোগ্য ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। ডিম্বাণু সৃষ্টির সমস্যাযুক্ত অনেক মহিলাই ক্লোমিফেন সাইট্রেট, হিউমেন মেনোপোজাল গোনাডোট্রফিন (hMG), ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) জাতীয় ওষুধ সেবন করে সফল হয়েছে।

৪। ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (Intra uterine insemination- IUI): একে কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বের সক্রিয় শুক্রাণুযুক্ত বীর্যকে সার্ভিক্সের মধ্য দিয়ে সরাসরি জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়। বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে অন্তঃজরায়ুজ ইনসেমিনেশন পদ্ধতির মাধ্যমে 15 থেকে 20 ভাগ সফলতা আসে।

৫। ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (Intra cytoplasmic sperm injection-ICSI): এ পদ্ধতিতে নিষেক ঘটানোর জন্য একটি সক্রিয় শুক্রাণুকে মাইক্রোইনজেশনের মাধ্যমে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করা হয়।

৬। সঠিক চিকিৎসা (Proper treatment): যেসব রোগের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় সেসব রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে প্রজনন অক্ষমতা দুর করা যায়।

পুরুষ ও নারীর যৌন হরমোনজনিত ভারসাম্যহীনতা
(Sex hormonal imbalance in men and women)

হরমোন মানবদেহে প্রজনন স্বাস্থ্য, মেজাজ, রক্তচাপ, রক্ত শর্করা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেহের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। প্রায় আট ধরনের হরমোন মানুষের জনন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এদের নিয়মিত ক্ষরণ ও সাম্যতা রক্ষা মানুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের সুস্থতা নির্দেশ করে। দেহের যৌন হরমোন মাত্রার উঠানামা নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুষের মেজাজ, যৌন আকাঙ্খা, শুক্র ও ডিম্ব উৎপাদন ক্ষমতা সবকিছুই হরমোনের মাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানব যৌন হরমোনের মধ্যে ইস্টোজেন, প্রোজেস্টেরন ও টেস্টোটেরন সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। এদের অতিমাত্রার বা অল্পমাত্রার ক্ষরণ জননতন্ত্রের সব ধরনের কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিম্নে এসব হরমোনের ভারসাম্যহীনতার প্রভাব বর্ণনা করা হলো:

- ইস্টোজেন ভারসাম্যহীনতা (Oestrogen imbalance): স্ত্রীদের স্তন ক্যানসার, জরায়ু ক্যানসার, বন্ধ্যাত্ব, ত্বকে কুৎসিত দাগ পড়া (acne), মেদ ও ভুড়ি, অতিরিক্ত ঘাম, বয়সের ছাপ পড়া, যৌন আকাঙ্খা হ্রাস (libido), হতাশা বৃদ্ধি পাওয়া, ক্লান্তি, স্মরণশক্তি হ্রাস, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অনিয়মিত মাসিক ও মুখে চুল গজানো (Polycystic ovarian syndrome-PCOS), ইত্যাদি উপসর্গ। পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া (Benign prostatic hyperplasia -BPH), প্রোস্টেট ক্যানসার, যৌন আকাঙ্খা হ্রাস, হতাশা, অসহিষ্ণুতা, মূত্রনালির সংক্রমণ (UTI), শুক্রাশয় ক্যানসার, ক্লান্তি ও অবসাদ ইত্যাদি উপসর্গ।
- প্রোজেস্টেরন ভারসাম্যহীনতা (Progesterone imbalance): বিরক্তির উদ্রেগ, হতাশা, বিষন্নতা, দেহের ওজন বৃদ্ধি, চড়া মেজাজ, অসহিষ্ণুতা, ফাইব্রোসিস্টিক স্তন, অনিয়মিত মাসিক, Premenstrual syndrome (PMS), পেট ফাঁপা, ক্যানডিডা (candida), মাথা ব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত, এন্ডোমেট্রিওসিস ইত্যাদি উপসর্গ।
- টেস্টোস্টেরন ভারসাম্যহীনতা (Testosterone imbalance): যৌন আকাঙ্খা হ্রাস, হতাশা, অস্থিক্ষয়, BPH, প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, বয়সের ছাপ পড়া, অ্যান্ড্রোপেজ (Andropause), স্মরণশক্তি হ্রাস, করোনারি ডিজিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, PCOS, ত্বকে কুৎসিত দাগ পড়া, মাথায় টাক পড়া ইত্যাদি উপসর্গ।

ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা (Fetal growth retardation)

ব্যাপক অর্থে ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা বলতে মায়ের গর্ভে শিশুর বৃদ্ধির যে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতাকে বুঝায়। অধিকাংশ শিশুই স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণত জন্মের সময় একজন স্বাভাবিক নবজাতকের ওজন 6.2 থেকে 9.2 পাউন্ড এবং উচ্চতায় 19 থেকে 21 ইঞ্চি হয়ে থাকে। নবজাতকের ওজন ও উচ্চতা এর চেয়ে বেশি বা কম হলে ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক শিশু গর্ভধারণের 37

CamScanner

সপ্তাহ পরে ভূমিষ্ট হয়, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যার কারণে শিশু এর আগেই ভূমিষ্ট হয়ে যায়। এসবক্ষেত্রে স্বভাবতই অপরিণত শিশু জন্ম নেয়। প্রায় 20% ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা দেখা যায়।

প্রকার: সাধারণত দুধরনের ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা দেখা যায়। যথা-

১। **ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশন** (Intrauterine growth restriction -IUGR): IUGR এর ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম থাকে এবং ওজনে স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে 10% কম হয়। অনেক কারণে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, তবে প্রধান কারণ হলো গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি অথবা ভ্রূণের পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় 40 লক্ষ নবজাত শিশু মৃত্যুর 60% ই ঘটে IUGR এর কারণে।

২। **ম্যাক্রোসোমিয়া** (Macrosomia): ম্যাক্রোসোমিয়ার ক্ষেত্রে শিশু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকে কিন্তু ওজন ও আকারে অনেক বড় হয়। এজন্য একে বিগ বেবি সিনড্রোম (big baby syndrome) বলে। এক্ষেত্রে জন্মের সময় শিশুর ওজন প্রায় 8 পাউন্ড বা 13 আউন্স বা 4 কিলোগ্রাম বা এর বেশি হয়ে থাকে। আমেরিকার গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে 10% এর অধিকে ম্যাক্রোসোমিয়া দেখা যায়। এদের প্রায় সকলেরই সিজারিয়ান প্রসব (Cesarean delivery) করানো হয়, তা নাহলে স্বাভাবিক প্রসবে জনন নালি কিংবা শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

কারণ: অমরা দ্বারা খাদ্য ও পুষ্টি পরিবহন বাধাগ্রস্থ হলে IUGR লক্ষণ দেখা দেয়। এছাড়া মায়ের পুষ্টিহীনতা, ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যালকোহল বা মাদক সেবন ইত্যাদি কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ডায়াবেটিস সমস্যা ও অতিরিক্ত ওজন থাকলে এবং জিনগত কারণে ম্যাক্রোসোমিয়া হয়ে থাকে।

লক্ষণ: IUGR এর কারণের উপর নির্ভর করে শিশু ছোট বা অপুষ্টি লক্ষণযুক্ত কিংবা মৃত ভূমিষ্ট হতে পারে। জীবিত শিশুগুলো দেখতে ফ্যাকাশে, ঢিলে ত্বকযুক্ত এবং সংক্রমণ অপ্রতিরোধী হয়। জন্মের দুবছরের মধ্যে এরা স্বাভাবিক আকারে পৌছালেও এদের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধিজনিত সমস্যা থাকে। ম্যাক্রোসোমিয়া লক্ষণযুক্ত শিশুও মৃত ভূমিষ্ট হতে পারে। এছাড়া স্বাভাবিক প্রসব হলে এসব শিশু ট্রমা (trauma) ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ম্যাক্রোসোমিয়া লক্ষণযুক্ত শিশুগুলোর ডায়াবেটিস, নিম্ন রক্ত শর্করা, শ্বসন সমস্যা এবং জন্ডিস আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার: শিশুর IUGR থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গর্ভবতী মাকে পুষ্টিকর খাবার ও যথেষ্ট বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ধূমপান, অ্যালকোহল বা মাদক সেবন ত্যাগ করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার চিকিৎসা নিতে হবে।

শিশুর ম্যাক্রোসোমিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো মায়ের শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। সিজারিয়ান প্রসবও এধরনের ঝুকি থেকে মুক্ত করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এসব শিশুকে জন্মের সাথে সাথে খাবার দিতে হয়। মায়ের ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

৯.৭ যৌনবাহিত রোগ: লক্ষণ ও প্রতিকার

যেসব রোগ মানুষের যৌন আচরণের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় তাদের যৌনবাহিত রোগ **(Sexually transmitted diseases =STD)** বা ভেনারিয়েল ডিজিস **(venereal diseases=VD)** বলে। এদেরকে বর্তমানে যৌন বাহিত সংক্রমণ (sexually transmitted infections =STI) বা এস টি আই বলে, কেননা রোগ সৃষ্টি ছাড়াও এরা একদেহ হতে অন্যদেহে সংক্রমিত হতে পারে। এদের কিছুসংখ্যক শিরায় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ দ্বারা, শিশু জন্মেও মাধ্যমে কিংবা মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। যৌন বাহিত সংক্রমণ শত শত বছর যাবত অতি পরিচিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এর অধ্যয়নকে ভেনারিওলজি (venereology) বলে। সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রোটোজোয়া কিংবা পরজীবী দ্বারা এসব রোগ সৃষ্টি হয়। নিম্নে মানবদেহে যৌন বাহিত সংক্রমণ সংক্রান্ত একটি তালিকা উল্লেখ করা হলো:

CamScanner

সংক্রমকের নাম	রোগের নাম	সংক্রমকের প্রজাতি
ব্যাকটেরিয়া	ক্ল্যামাইডিয়া	*Chlamydia trachomatis*
	গনোরিয়া	*Neisseria gonorrhoeae*
	সিফিলিস	*Treponema pallidum*
ভাইরাস	হেপাটাইটিস	*Hepatitis virus*
	হার্পিস	*Herpes simplex virus* 1, 2
	এইডস	*Human Immunodeficiency Virus*
পরজীবী	পিউবিক উকুন	*Pthirus pubis*
	স্ক্যাবিস	*Sarcoptes scabiei*
প্রোটোজোয়া	ট্রাইকোমোনিয়াসিস	*Trichomonas vaginalis*

এদের মধ্যে সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস রোগের সংক্রমণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

সিফিলিস (Syphilis)

সিফিলিস একটি জটিল যৌন সংক্রামক রোগ। বিশ্বজুড়ে সব যৌনরোগের শীর্ষে যে রোগটি তার নাম সিফিলিস। গাইরোল্যামো ফ্রাকাস্টোরো (Girolamo Fracastoro, 1483-1553) নামক একজন ইটালিয়ান চিকিৎসক ও কবির একটি কবিতার নায়ক সিফিলাসের (Syphilus) নাম থেকে এরোগের নামটি এসেছে। ঈশ্বর ও ধর্ম নিন্দা করার জন্য দেবতা অ্যাপোলো কর্তৃক কবিতার নায়ক সিফিলাস ও তার অনুসারীদের এ জটিল নতুন রোগ দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আমেরিকা আবিষ্কারের পর (1492) কলম্বাসের নাবিকদের মাধ্যমে সিফিলিস রোগটি ইউরোপে আসে। কয়েক বছরের মধ্যে এটি সমগ্র ইউরোপ ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বব্যাপী সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। বাংলাদেশে এরোগের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের চেয়ে শহর অঞ্চলের নারী ও পুরুষে এরোগটি বেশি দেখা যায়। কেবল 2015 সালে 6 মিলিয়ন নতুন রোগীসহ বিশ্বে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় 45.5 মিলিয়ন, যাদের মধ্যে প্রায় 107,000 লোকের মৃত্যু ঘটেছে।

রোগের কারণ ও সংক্রমণ

সিফিলিস একটি যৌন বাহিত রোগ (STI)। *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এরোগ সংক্রমিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। এ জীবাণুগুলো গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় বসবাস করতে পছন্দ করে। ফলে মুখ, পায়ুপথ ও যৌনাঙ্গকে এরা সহজেই বেছে নেয়। মূলত নারী পুরুষের সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে এরোগ ছড়ায়। যেকোন ধরনের (যোনি, মুখ ও পায়ুপথ) যৌন মিলনের মাধ্যমে এরোগে এক দেহ হতে অন্যদেহে সংক্রমিত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতের সাথে সরসরি সংস্পর্শের (যেমন- চুম্বন) মাধ্যমেও সিফিলিস ছড়াতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত টয়লেট, বাথট্যাব, পোষাক, খাবার পাত্র ও সুইমিং পুল ব্যবহারের মাধ্যমেও সিফিলিস ছড়াতে পারে। রোগীর রক্ত গ্রহণের মাধ্যমেও এরোগ সংক্রমিত হয়। আবার গর্ভাবস্থায় মায়ের সিফিলিস থাকলে সন্তান সেখান থেকে এরোগে আক্রান্ত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

চিত্র ৯.১৮ *Treponema pallidum*

রোগের লক্ষণ ও জটিলতা

প্রাথমিক পর্যায় (Primarystage) : রোগের শুরুর অবস্থাকে প্রাইমারি সিফিলিস (primary syphilis) বলে। সংক্রমণের 10 থেকে 100 দিনের মধ্যে চামড়ায় একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একে ক্যাঙ্কার (Canker) বলে।

CamScanner

ধীরে ধীরে এটা বড় হয়ে দৃঢ়, ব্যথা ও চুলকানিবিহীন লাল বর্ণের ফোস্কা বা ঘায়ের মতো হতে থাকে। একে শ্যাঙ্কার (chancre) বলে।

■ মাধ্যমিক পর্যায় (Secondary stage): প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের চিকিৎসা না করালে রোগের জীবাণু রক্তস্রোতে প্রবেশ করে এবং সমগ্রদেহে ছড়িয়ে পরে। এসময় চামড়ায় ছোট ছোট লাল ফুসকুড়ি (rash) দেখা যায়। পরবর্তী 2 মাসের মধ্যে এসব ফুসকুড়ি আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং বুক, হাত, পা, হাতের তালু ও পায়ের তলাতে ছড়িয়ে পরে। এসব ফুসকুড়ি লাল বর্ণের দাগ হিসেবে থাকে অথবা আঁইশের রূপ ধারণ করে, কিন্তু দেহে কোনো চুলকানির সৃষ্টি করে না। এসব উপসর্গের পাশাপাশি রোগীর মৃদু জ্বর, মাথা ব্যথা ও ক্লান্তিবোধ দেখা যায়। অনেকসময় ব্যাকটেরিয়া মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মেনিনজাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো মানুষে রক্তশূণ্যতা ও জন্ডিস দেখা যায়। রোগের এ অবস্থাকে সেকেন্ডারি সিফিলিস (secondary syphilis) বলে। তবে অনেকের ক্ষেত্রে রোগটি সুপ্ত পর্যায়ে চলে যায় এবং বছর দুয়েক সুপ্ত থাকার পর ভয়াভহরূপে দেখা দেয়।

চিত্র ৯.১৯ সিফিলিস রোগের লক্ষণসমূহ

■ চূড়ান্ত পর্যায় (Final stage): রোগ শুরুর 10-12 বছর পর সিফিলিস পূর্ণাঙ্গরূপে আর্বিভূত হয় এবং এরোগ পায়ুপথ, ঠোট, মুখ, গলনালি, খাদ্যনালি এমনকি শ্বাসনালিতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে চিকিৎসাহীন থেকে গেলে পুরুষাঙ্গের মাথায় বিশাল আকৃতির বিশ্রী ক্ষত বা ঘা হয়, অবস্থা আরো জটিল হয়ে এক সময় এরোগ চোখ, স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। রোগের এ অবস্থাকে টারসিয়ারি সিফিলিস (tertiary syphilis) বলে। শেষ পয়ায়ে এরোগ রোগীকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

জন্মগত সিফিলিস (Congenital syphilis): সিফিলিসে আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় বা জন্মদানের সময় শিশু এরোগে আক্রান্ত হলে তাকে জন্মগত সিফিলিস বলে। তবে জন্মের সময় রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। জন্মগত সিফিলিসের প্রথম দিকে যেসব লক্ষণ দেখা যায় সেগুলো হলো: নাকে অবিরাম সর্দ্দি ঝরা, ত্বক ফেটে যাওয়া, হাড়ের অস্বভাবিকতা, চোখ, যকৃত ও বৃক্কের সমস্যা। জন্মের দুই বছরের মধ্যে রোগীর কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, দাঁতের ত্রুটি, অন্ধত্ব ও বধিরতা দেখা দিতে পারে।

রোগ শনাক্তকরণ

বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এরোগটি শনাক্ত করা যায়। রক্ত পরীক্ষার মধ্যে বর্তমানে TPHA test (Treponemal pallidum particle agglutination test), FTA-Abs test (Fluorescent treponemal antibody absorption test), VDRL test (Veneral disease research laboratory test) প্রচলিত।

চিকিৎসা

প্রাথমিক পর্যায়েই সিফিলিসের চিকিৎসা করানো উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী Penicillin /Ceftriaxone/ Doxycyclin/Azithromycin শ্রেণির অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সেবন অথবা ইনজেকশন গ্রহণ করলে এরোগ সম্পুর্ণরূপে ভালো হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী বা যৌনসঙ্গী উভয়েরই চিকিৎসা নেয়া উচিত অন্যথায় এর সংক্রমণ সঙ্গীর নিকট থেকে আবারো হতে পারে। এরোগের কোনো প্রচলিত টিকা বা ভ্যাক্সিন নেই।

প্রতিরোধ

■ অবাধ যৌন মিলন না করে সুস্থ জীবন যাপন ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই এরোগ প্রতিরোধের উপায়।

CamScanner

- রক্ত দেয়া বা নেয়ার সময় যাতে পুরোনো সুই ব্যবহার না করা হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- যৌন মিলনে মিলনে বিশ্বস্ত সঙ্গী বেছে নেয়া এবং যথোপযুক্ত প্রতিরোধসহ যৌনমিলনে অংশগ্রহণ করা।
- যৌন কর্মী ও বহুগামীদের নিয়মিত STD পরীক্ষা করা। বহুগামিতা পরিহার করা।
- যৌন কর্মীদের সামাজিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

গনোরিয়া (Gonorrhea)

গনোরিয়া একটি সাধারণ যৌন সংক্রামক রোগ। সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় 200 মিলিয়ন লোক এরোগে আক্রান্ত হয়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই মারা যায়। তবে এরোগ যৌন সক্রিয় টিনেজারদের মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করে। মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা এরোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের কারণ ও সংক্রমণ

Neisseria gonorrhoeae নামক ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে গনোরিয়া রোগের জন্য দায়ী। এ জীবাণু দেহের জননালি, যোনি, জরায়ু, পায়ুপথ, মুখ, গলা প্রভৃতি উষ্ণ ও সিক্ত স্থানের মিউকাস পর্দায় সহজেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। গনোরিয়া আক্রান্ত লোকের সাথে কেবল যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এক দেহ হতে অন্যদেহে স্থানান্তরিত হয়। সংক্রমিত বিছানার চাদর বা তোয়ালে থেকে শিশুরা এরোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। ঘন বসতি এবং অপরিচ্ছন্নতা থেকে বাচ্চাদের গনোরিয়া হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

পুরুষদের ক্ষেত্রে: শতকরা 10-15 ভাগ পুরুষ উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে। যাদের উপসর্গ দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে-

১। প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আকাঙ্খা, ঘন ঘন প্রস্রাব করা ।
২। পরবর্তীতে মূত্রনালি দিয়ে মিউকাসের মতো নিঃসরণ আসে, দ্রুত তা পুঁজে পরিণত হয়।
৩। প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, সেমিনাল ভেসিকলের প্রদাহ এবং এপিডিডাইমিসের প্রদাহের সঙ্গে জ্বর হয়।
৪। অতঃপর মূত্রনালির অস্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা ঘটতে পারে।
৫। দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, সেপটিসেমিয়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি হতে পারে।
৬। সমকামীরা পায়ুপথে যৌনসঙ্গম করলে পায়ুপথ সংক্রমিত হয়ে মলনালিতে তীব্র ব্যথা হয় এবং রসে ভিজে যায়।

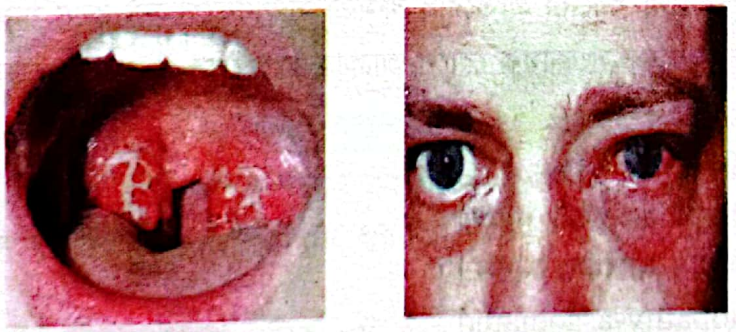

চিত্র ৯.২০ গনোরিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

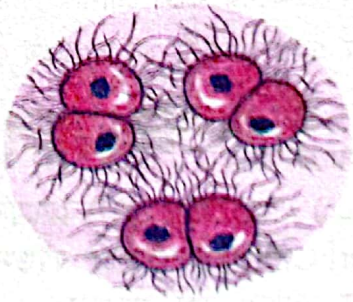

চিত্র ৯.২১ *Neisseria gonorrhoeae*

মহিলাদের ক্ষেত্রে: শতকরা 50-75 ভাগ মহিলা উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে। যাদের উপসর্গ দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে-

১। যৌনাঙ্গ সংক্রমণের কারণে যোনির ওষ্ঠে লাল, দগদগে ঘা হয়।
২। যোনিপথে অস্বাভাবিক সাদা বা হলুদ বর্ণের স্রাব নিঃসরণ ঘটে।
৩। প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আখাঙ্কা, ঘন ঘন প্রস্রাব করা ।

CamScanner

৪। তলপেটে ব্যথা হয়।

৫। ডিম্বনালিতে প্রদাহ হয়।

৬। মাসিক অনিয়মিত হয় এবং তার তীব্র ব্যথা হয়।

৭। পায়ুপথে সঙ্গম থেকে কিংবা নিজ যোনি থেকে পায়ুপথ সংক্রমিত হলে মলনালি পথে নিঃসরণ ও রক্তক্ষরণ হতে পারে।

৮। দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, সেপটিসেমিয়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি হতে পারে।

৯। ডিম্বনালিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সারা জীবনের জন্য বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে।

১০। মায়ের এরোগ থাকলে শিশু **অপথালমিয়া নিওন্যাটারাম** নামক চোখের প্রদাহ নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

চিকিৎসা

বর্তমানে গনোরিয়ার অনেক ওষুধ বের হয়েছে। রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। জটিলতাহীন গনোরিয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত একক মাত্রায় উপযুক্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধ বেশ ভালো কাজ দেয়। সাধারণত পেনিসিলিন ব্যবহারে সংক্রমণ সেরে যায়। কিন্তু অন্যান্যক্ষেত্রে 50% পর্যন্ত সংক্রমণ পুরোপুরি পেনিসিলিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। একক মাত্রায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিন গনোরিয়া চিকিৎসায় বেশ কার্যকর।

প্রতিরোধ

১। নিরাপদ যৌন সঙ্গম করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা।

২। বহুগামীতা পরিত্যাগ করা এবং অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

৩। যৌন মিলনে কনডমের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

৪। নিজে এরোগ দ্বারা আক্রান্ত হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কারো সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।

৫। আক্রান্ত রোগীর যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

এইডস (AIDS)

এইডস মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রের একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। প্রকৃতপক্ষে এইডস কোনো বিশেষ প্রকৃতির রোগ নয়। **HIV** (Human Immunodeficiency Virus) সংক্রমণের ফলে রোগীর শরীরে সংক্রমণ উত্তর অবস্থাকে (HIV post infection condition) **এইডস** (AIDS=Aquired immune deficiency syndromes) বলা হয়। HIV সংক্রমণের ফলে রোগীর শরীরের যে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে একজন এইডস রোগী খুব সহজেই যে কোনো ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে পারে।

1983 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী **ড. লুই মনট্যাগনিয়ার** (Dr. Lue Montagnier) এবং 1984 সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী **ড. রবার্ট গ্যালো** (Dr. Robert Gallo) পৃথকভাবে এইডস এর ভাইরাস আবিষ্কার করেন। মনট্যাগনিয়ার এদের নাম দেন Lymphadenopathy-associated virus (LAV)। কিন্তু গ্যালো এদের নাম দেন Human T-cell Lymphotropic virus, strain III (HTLV-III)। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ভাইরাস নামকরণ কমিটি 1986 সালে একে HIV নামে স্বীকৃতি দেন। HIV ভাইরাস মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T-helper cell কে ধ্বংস করে যা শরীরের অনাক্রম্যতন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

চিত্র ৯.২২ লালফিতা, HIV পজেটিভ ব্যক্তি ও এইডস-এ আক্রান্তদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের প্রতীক

CamScanner

বিভিন্ন সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে 1979 সালের পূর্ব পর্যন্ত মানবদেহে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ছিল না। আফ্রিকায় এ ভাইরাস সর্বপ্রথম বানরের দেহ হতে মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এটি ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। 2012 সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় 36 মিলিয়ন মানুষ এইডস রোগে মারা গেছে এবং আরো প্রায় 35.3 মিলিয়ন মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত। এইডস বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত (pandemic) একটি ভয়াবহ যৌন রোগ যা প্রতিনিয়ত আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

HIV সংক্রমণের উপায়

HIV শরীরের বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচে না। তাই সরাসরি রক্ত বা যৌন নিঃসরণ শরীরে প্রবেশ না করলে HIV সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম। তাই HIV সংক্রমণ ছোঁয়াচে নয়। শুধুমাত্র স্পর্শ, একসাথে খাওয়া দাওয়া, খেলাধুলা, আলিঙ্গণ, এমনকি একই জামা কাপড় পরিধান করা বা মশার কামড় দ্বারা HIV ছড়ায় না। একজন আক্রান্ত রোগী থেকে নিম্নলিখিত উপায়ে HIV ভাইরাস একজন সুস্থ মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে:

- নারী-পুরুষের যে কোনো ধরনের (মুখ, যোনি, পায়ুপথ) যৌন মিলন।
- সংক্রমিত সিরিঞ্জ ব্যবহার ও সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ।
- সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশু অথবা দুগ্ধ পান দ্বারা।
- সেলুনে একই ব্লেড বা ক্ষুর বিভিন্ন জনে ব্যবহার করা।
- দন্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা গ্রহণকারী।

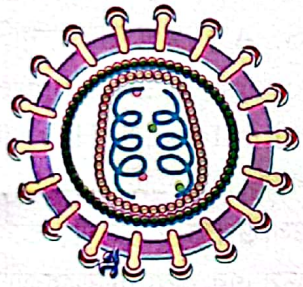

HIV ভাইরাস

HIV সংক্রমণের উপায়

HIV আক্রান্ত রোগী

এইডস এর লক্ষণ

HIV সংক্রমণের সাথে সাথেই এইডস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কোনোরকম লক্ষণ ছাড়াই HIV জীবাণু মানুষের শরীরে 10 বছর নিরবে বাস করতে পারে। যদিনা উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করা হয় HIV জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত সকল রোগীতে AIDS এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরা সবল অনাক্রম্যতন্ত্র বিশিষ্ট মানুষ অপেক্ষা বিভিন্ন সংক্রমণে প্রতি অধিক সংবেদনশীল হয়। এ ধরনের সংক্রমণকে সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ (opportunistic infections) বলে। HIV জীবাণু দ্বারা এইডস আক্রান্ত রোগীর অনাক্রম্যতন্ত্রের শ্বেত রক্তকণিকা T-helper cell ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ফলে রোগীর দেহে ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে-

১। প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর দেহে জ্বর আসে, মাথা ব্যথা হয় এবং ক্লান্তিবোধ হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বর দীর্ঘায়িত হয়।

২। রোগীর দেহের বিভিন্ন লসিকা গ্রন্থি ফুলে যায় এবং শরীর শুকিয়ে ওজন কমতে থাকে।

৩। রোগী নিউমোনিয়া দেখা দেয়ায় নিঃশ্বাসে সাঁ সাঁ শব্দ (wheezing) হয়।

৪। মস্তিষ্ক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ট্রক্সোপ্লাজমোসিস ঘটে, ফলে চিন্তাশক্তি বিঘ্নিত হয় অথবা স্ট্রোকের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়।

৫। মস্তিষ্কের লসিকা কলায় লিম্ফোমা (Lymphoma) ক্যানসার সৃষ্টি হয়, ফলে রোগীর সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা হয় এবং ক্রমে স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়।

৬। অন্ননালি ঈস্ট দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পেট ব্যথার সৃষ্টি করে এবং খাবারে অনিহা হয়।

CamScanner

৭। ফুসফুসে অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ ঘটে এবং বুকে ব্যথাসহ শুষ্ক কফ জমে।

৮। অস্থিসন্ধিসমূহে প্রচণ্ড ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং দেহে জ্বালাপোড়া হয়।

৯। ত্বক ও মুখের লসিকানালি ও রক্তনালির আবরণীতে কারপোসি সারকোমা (Kaposi's sarcoma) নামক ক্যানসার সৃষ্টি হওয়ায় ত্বক ও মুখে বাদামী বা লালচে বর্ণের দাগ দেখা যায়।

১০। সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে পরিশেষে রোগী মৃত্যুবরণ করে।

রোগ নির্নয়

রক্তের পরীক্ষার দ্বারা দেহে HIV এর সংক্রমণ নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে রক্তের যেসব পরীক্ষা করা হয় সেগুলো হলো-HIV অ্যান্টিবডি টেস্ট, RNA টেস্ট, p24 protein টেস্ট, ওয়েস্টার্ন ব্লট (Western blot) টেস্ট ইত্যাদি। AIDS আক্রান্ত রোগীর রক্তে T-helper cells বা CD4 cell গণনা করার জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। রক্তে যদি CD4 cell এর পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে তাহলে বুঝা যায় HIV অনাক্রম্যতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। (রক্তের স্বাভাবিক CD4 cell এর পরিমাণ 500 - 1,500 cells/mm^3)

এইডস এর চিকিৎসা

এইডস এর সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোনো চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার চিকিৎসা সহজলভ্য হয়েছে। গবেষকগণ এইডস এর অনেক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা রোগীকে কিছুটা সুস্থ ও দীর্ঘায়ু দানে সহায়তা করে। ওষুধ সহযোগে এইডস এর চিকিৎসাকে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি বা আর্ট (antiretroviral therapy -ART) বলে। বর্তমানে FDA (Food and Drug Administration, U.S. A.) অনুমোদিত দুটি গ্রুপের ওষুধের ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। প্রথম গ্রুপের ওষুধ হলো Nucleoside reverse transcriptase inhibitors যা HIV সংক্রমণকে বিলম্বিত করে। দ্বিতীয় গ্রুপের ওষুধ হলো Protease inhibitors যা HIV এর প্রতিলিপনে বাধা সৃষ্টি করে। এদুটি গ্রুপের ওষুধ একত্রে সেবন করতে হয়। এইডসের এ চিকিৎসা পদ্ধতিটি Highly Active Antiretroviral Therapy বা HAART নামে পরিচিত। যদিও HAART এইডস উপশম করে না, তবে এ ধরনের রোগীর মৃত্যু সংখ্যা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। FDA অনুমোদিত এইডস এর অন্যান্য কয়েকটি ওষুধ হলো: *Fusion Inhibitors, Entry Inhibitors, Integrase Inhibitors, Pharmacokinetic Enhancers* ইত্যাদি।

HIV প্রতিরোধ

এইডস এর কোনো ভ্যাক্সিন এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। কিছু আচরণ বর্জন কিংবা পরিবর্তন দ্বারা HIV সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নে HIV প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো:

১। নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা।

২। HIV আক্রান্ত কারো সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকা।

৩। যৌন মিলনে কনডমের ব্যবহার করা এবং ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

৪। এইডস-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে গণমাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।

৫। ইনজেকশন গ্রহণের সময় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার না করা এবং শিরার মাধ্যমে কোনো ড্রাগ গ্রহণ না করা।

৬। রক্ত গ্রহণের পূর্বে HIV সংক্রমিত কি না তা পরীক্ষা করা।

৭। সেলুনে একটি ব্লেড পুনব্যবহার না করে একবারই ব্যবহার করা।

৮। সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা।

৯। যৌন কর্মীদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।

১০। সতর্কতার সাথে নিজের শারীরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখা।

CamScanner

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

- ❑ **প্রজননতন্ত্র** : মানবদেহের যে তন্ত্র প্রজননের সাথে জড়িত তাকে প্রজননতন্ত্র বলে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ এদের পুং ও স্ত্রী জননতন্ত্র পৃথক দেহে অবস্থান করে।
- ❑ **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য** :যেসব বৈশিষ্ট্য শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে যৌবন প্রাপ্তির সময় দেহে প্রকাশ পায় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সূচনা করে তাদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বলে।
- ❑ **বয়োঃসন্ধিকাল** : মানবজীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রী দেহে বাহ্যিক গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকশিত হতে থাকে এবং প্রজনন অঙ্গগুলো সক্রিয় হতে শুরু করে তাকে বয়োঃসন্ধিকাল বলে।
- ❑ **স্পার্মাটোজেনেসিস** : যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয় থেকে স্পার্ম বা শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বা শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া বলে।
- ❑ **স্পার্মিওজেনেসিস** :যে জটিল প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে স্পার্ম বা শুক্রাণু গঠন করে তাকে স্পার্মিওজেনেসিস বলে।
- ❑ **উওজেনেসিস** : যে প্রক্রিয়ায় যৌন জননক্ষম স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাকে উওজেনেসিস বা ডিম্বাণুজনন প্রক্রিয়া বলে।
- ❑ **ভাইটেলিন আবরণী** :মানুষের সকল ডিম্বাণু একটি প্লাজমা আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। একে ভাইটেলিন আবরণী বলে।
- ❑ **নিষেক** : যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে এদের হ্যপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোমবাহী নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটিয়ে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম বিশিষ্ট জাইগোট গঠন করে তাকে নিষেক বলে।
- ❑ **ইমপ্লানটেশন** : বর্ধনশীল মানব ভ্রূণ জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়ার কৌশলকে ইমপ্লানটেশন বলে। নিষেকের 7-8 দিনের মধ্যে ভ্রূণ জরায়ুর পৃষ্ঠদিকের এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়।
- ❑ **ক্লিভেজ** :যে পদ্ধতিতে জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা সম্ভেদ বলে।
- ❑ **অর্গানোজেনেসিস** প্রাণীর বিভিন্ন ভ্রূণীয়স্তর থেকে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠন করার প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে।
- ❑ **অমরা** : অমরা বা প্লাসেন্টা হলো মাতৃকলা ও ভ্রূণকলা নিয়ে গঠিত অস্থায়ী অঙ্গ যার মাধ্যমে ভ্রূণ মাতৃদেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নিজ দেহ থেকে বর্জ্য বহিষ্কার করে। মানুষের ভ্রূণ গঠনের 12 সপ্তাহ পরে অমরা গঠিত হয়।
- ❑ **নাভি রজ্জু** : নাভি রজ্জু বা অ্যামবিলাকাল কর্ড হলো জরায়ুতে বিকাশমান ফিটাস ও অমরার মধ্যে সংযোগকারী প্রায় 50 সেন্টিমিটার লম্বা রজ্জু আকৃতির একটি গঠন যাতে দুটি ধমনি ও একটি শিরা থাকে। এর মাধ্যমে শিশু অমরা হতে রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বর্জ্য ত্যাগ করে।
- ❑ **টেস্ট টিউব বেবি** : ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আইভিএফ বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। এর মাধ্যমে যে শিশু জন্ম নেয় তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলে।
- ❑ **ভেনারিয়েল ডিজিস** : যেসব রোগ মানুষের যৌন আচরণের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় তাদের যৌনবাহিত রোগ বা ভেনারিয়েল ডিজিস বলে।
- ❑ **এইডস** : HIV সংক্রমণের ফলে রোগীর শরীরে সংক্রমণ উত্তর অবস্থাকেই এইডস বলা হয়। 1983 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ড. লুই মনট্যাগনিয়ার এবং 1984 সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী ড. রবার্ট গ্যালো পৃথকভাবে এইডস এর ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

CamScanner